Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

শাকিব হোসেন, ২য় শ্রেণি, রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

জিহাদুল আলম, ৭ম শ্রেণি, একরামুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়, রামপুরা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

শাকিব হোসেন, ২য় শ্রেণি, রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

জিহাদুল আলম, ৭ম শ্রেণি, একরামুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়, রামপুরা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

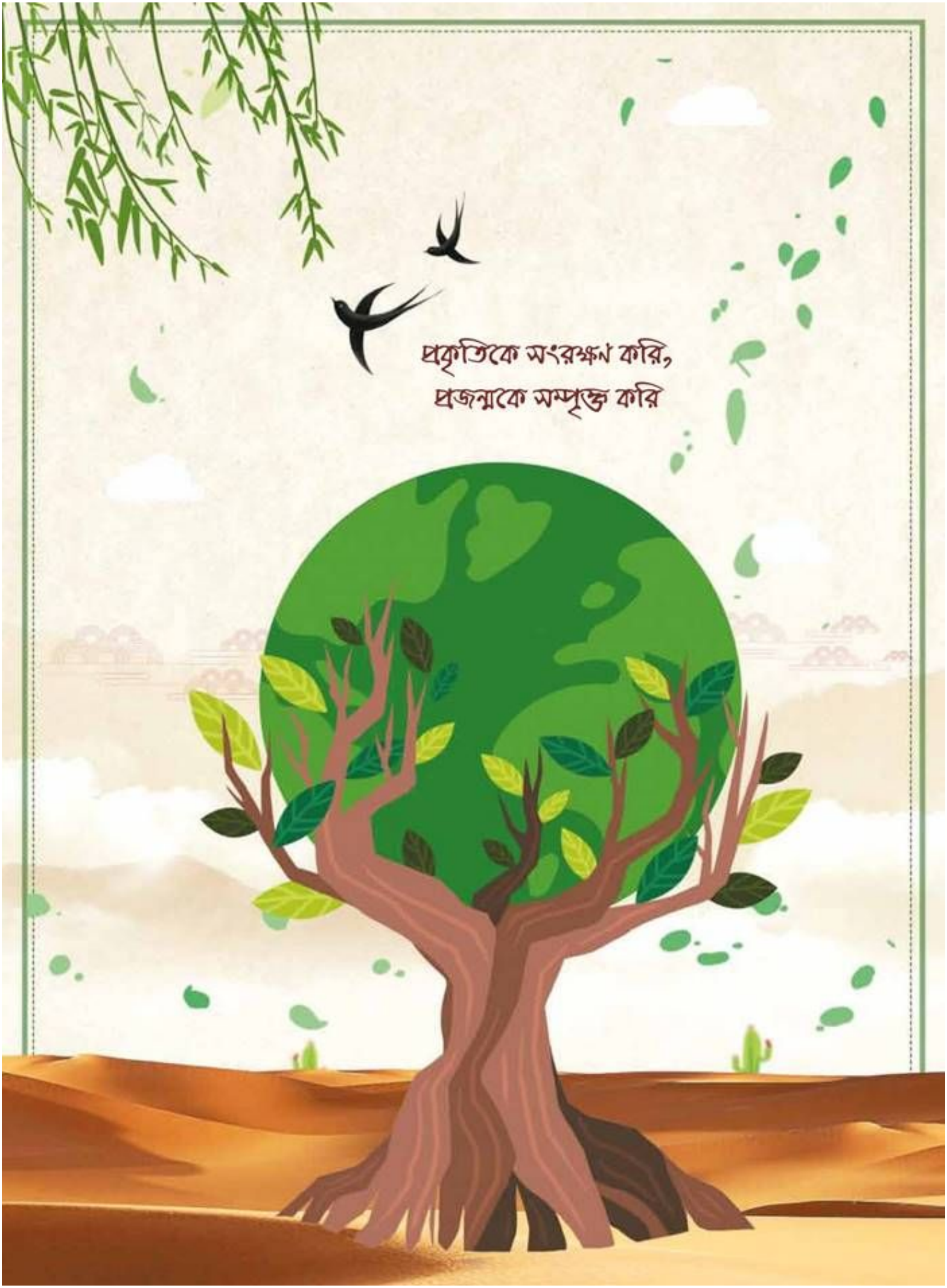

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এ দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য, টিকে থাকার জন্য সুস্থ, সুন্দর পরিবেশ খুবই প্রয়োজন। পরিবেশ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করি, প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করি'।

এ বছর মুজিববর্ষে দেশকে সবুজে শোভিত করতে 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০২১' এর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'মুজিববর্ষে অঙ্গীকার করি, সোনার বাংলা সবুজ করি'। অন্যদিকে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) এবারের বিশ্বজুড়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'ইকোসিস্টেম রেস্টোরেশন বা বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার'।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও পরিবেশ বিষয়ে খুবই সোচ্চার। এ ব্যাপারে তিনি সবসময়ই বিশেষ করে প্রতি বছরই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে দেশের সর্বত্র বৃক্ষরোপণের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং নিজেও গাছ লাগান।

বন্ধুরা, অনেকদিন ধরেই তোমরা স্কুলে যেতে পারছ না। এটা সত্যিই খুব কষ্টের। করোনার আতঙ্কটা তো এখনো রয়েই গেছে। তাই তোমরা বাসায় বসেই যেটুকু পারো পড়াশুনা চালিয়ে যাও আর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো।

২১শে জুন বিশ্ব বাবা দিবস। বাবা দিবসে বিশ্বের সকল বাবাদের প্রতি রইল ভালোবাসা। ভালো থেকো বন্ধুরা, ভালো রেখো তোমাদের পরিবেশ।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফফাত আঁখি
মো. মাছুদ আলম

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : প্রিয়াংকা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ৭৬/ই নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

০৪ পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা/আনজীর লিটন
১৫ ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবস/নুসরাত জাহান
৩৩ আর নয় পরিবেশ দূষণ/হারুন-উজ-জামান
৪৫ সবুজে মোড়ানো বিদ্যালয়/মনজুর হোসেন
৪৬ বোতল বন্দি সবুজ পৃথিবী/তারেক আজিজ
৫০ বাবা আমার/মেজবাউল হক
৫৬ বিরল দৌম ফল/শাহানা আফরোজ
৫৭ শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫৮ নতুন প্রাণীর সন্ধান/আবিদ সাজেদ
৫৯ শিশু দেয়ালিকার অনন্য প্রতিভা/জান্নাতে রোজী
৬০ বিশেষ শিশুর ব্যায়াম/মো. জামাল উদ্দিন

গল্প

০৮ জলঢাকার সোনালি দিন/সেলিনা হোসেন
১৭ গুড বয় পাবলো/ঝর্ণা দাস পুরকায়স্থ
২৭ রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী/মুস্তাফা মাসুদ
৩০ বৃক্ষের ভালোবাসা/প্রণব মজুমদার
৩৮ হিরো রোগ ও মাছের জরুরি সভা/মোস্তাফিজুল হক
৪০ ধুড়ুম/খায়রুল বাবুই
৪৩ মিমিদের বৃক্ষরোপণ/রুমান হাফিজ

সাফল্য প্রতিবেদন

৫৪ ভিন্নধর্মী স্কুল/আব্দুল কাদের
৬১ দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফফাত আঁখি

ভাষা দাদু

৪৮ বাংলা ভাষার প্রথম শব্দকোষ/তারিক মনজুর

বড়োদের কবিতা

২৫ স্মৃতির অ্যালবাম/মোহাম্মদ জিয়ন
২৬ এমন যদি হতো/ইশরাত আরা দ্যুতি
২৬ বঙ্গবন্ধু/এম এ নাসের
৩২ গাছ লাগাব দেশ বাঁচাব/ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান
৩৫ আম-কাঁঠালের দিনে/সনজিত দে
৩৭ রানি হবো/রুস্তম আলী
৩৭ গ্রামের সন্ধ্যা/মো. কামাল শেখ
৩৭ চুপ চুপ/রোকসানা গুলশান
৫১ সবার বাবা/আবেদীন জনী

ছোটোদের ছড়া

০৭ গাছ/মেশকাউল জান্নাত বিথী
৩৬ ছড়ার হাটে/শাকিব হুসাইন
৩৬ বর্ষা/মো. আবুবকর
৩৬ বৃষ্টি পড়ে/সুমাইয়া আক্তার

ছোটোদের গল্প

৫২ টর্চলাইট/মুমতাহিনা জাহান

ছোটোদের আঁকা

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: শাকিব হোসেন, জিহাদুল আলম
শেষ প্রচ্ছদ: মাহিমা চৌধুরী

১৪ আকিফ মুতাসিম
১৬ নাবিহা উমাইজা জাহান
৩৩ মো. রাফিউল ইসলাম
৪৩ প্রজ্ঞা সঞ্চারী মন্ডল
৪৭ মো. আবদুল্লাহ বায়েজীদ
৬৩ মো. ওয়াজেদ হোসেন পরশ
৬৩ মোঃ আমিনুল ইহসান বসুনীয়া
৬৪ ফাতিমা জারা
৬৪ আহানাফ আহমেদ

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা

আনজীর লিটন

আমাদের স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ। এখানে আমাদের সব আছে। আমাদের বাংলা ভাষা আছে। লাল-সবুজের পতাকা আছে। মানচিত্র আছে। আমাদের গান আছে। কবিতা আছে। গল্পকথার ঝুলি আছে। নাটক আছে। রূপকথা আছে। রঙিন প্রজাপতি আছে। আছে জোনাকিদের মিষ্টিমুখর আলোর খেলা। মাথার ওপর অবারিত নীল আকাশ। এ আকাশ আমাদের। আকাশের বুকে ডানা মেলে উড়ে যাওয়া পাখি আমাদের। আমাদের ছয়টি ঋতু আছে। এই যে ফসলের মাঠ, উর্বরা জমিন সব কিছু আমাদের। সাগর-নদী, পাহাড়-বনবনানী সবকিছু আমাদের।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সুন্দরবনের সবুজ আলোয় দাপিয়ে বেড়ানো রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমাদের। ছুটে চলা হরিণের দল আমাদের। জেলেদের জালে আটকে পড়া মাছেদের ঝাঁক আমাদের। কক্সবাজারের বিশাল সমুদ্রসৈকত আমাদের। প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন আমাদের। এসব নিয়ে সেজেছে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি, বাংলাদেশ। এসব নিয়েই তো বাংলাদেশের পরিবেশ-প্রকৃতি। পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে। সব দেশের একটি নিজস্ব পরিবেশ-প্রকৃতি আছে। একটা আকাশের নিচে সারা পৃথিবী তার রূপ ছড়িয়ে দিয়েছে। একেকটা দেশের প্রকৃতির রূপ একেক রকম। কিন্তু যখন আমরা আমাদের দেশের দিকে তাকাব, দেখব পাখিরা গান করে। জোনাকিরা নেচে বেড়ায়। মাছেরা সাঁতার কাটে। গাছে-গাছে সবুজ পাতা দুলে ওঠে। আকাশে সূর্য হাসে। কলকল ছন্দে নেচে ওঠে প্রকৃতির ঝরনাধারা। মেঘটাকে সরিয়ে রংধনু তার রং ছড়িয়ে দেয় আকাশের বুকে। এইতো আমাদের মায়াভরা দেশের ছবি। পরিবেশের ছবি।

প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই পরিবেশ। সারা পৃথিবীর মানুষ নিজ নিজ দেশের পরিবেশ প্রকৃতিকে যত্ন নেয়। পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা বাড়াতে বিশ্বব্যাপী উদযাপন করা হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই দিবসের একটি নির্দিষ্ট তারিখ আছে। তারিখটি হচ্ছে ৫ই জুন। প্রতি বছর এই দিনটিকে বলা হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এরও একটি ইতিহাস আছে। ১৯৬৮ সালের ২০শে মে জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিষদের কাছে একটি চিঠি পাঠায় সুইডেন সরকার। চিঠিতে বলা হয় সারা পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। কেমন করে যত্নশীল হওয়া যায়, এ বিষয়ে বিশ্ব নেতাদের পরামর্শ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। জাতিসংঘ এই চিঠিটি পেয়ে গুরুত্ব সহকারে একটি উপায় বের করে। এরই ধারাবাহিকতায় সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ১৯৭২ সালে ৫-১৬ই জুন আয়োজন করা হয় পরিবেশ সম্মেলন। এই সম্মেলনটি পরিবেশ বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে ১৪৩ টিরও বেশি দেশ প্রতিনিধিত্ব করে। পরের বছর ১৯৭৩ সালে পরিবেশ বিষয়ক আরেকটি সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৪ সালে ৫ই জুন প্রথমবারের মতো 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উদযাপন করা হয়। সে বছর পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় 'অনলি ওয়ান আর্থ' বা 'একমাত্র পৃথিবী'।

এরপর থেকে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী পালন করা হচ্ছে 'পরিবেশ দিবস'। বাংলাদেশেও এই দিবসটি উদযাপিত হয়। এ বছর পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য 'প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার, হোক সবার অঙ্গীকার'।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমাদের পরিবেশ রক্ষা করতে হবে'। এই পরিবেশ রক্ষার জন্য তিনি বেশি বেশি গাছ লাগানোর কথা বলেছেন। এ উপলক্ষ্যে জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর উদবোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৫ই জুন গণভবন চত্বরে গাছের চারা রোপণ করার মধ্য দিয়ে তিনি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির শুভ সূচনা করে বলেছেন, 'যেখানে যতটুকু জায়গা পান, গাছ লাগান'। পরিবেশ রক্ষার জন্য আমাদের বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে। গাছের প্রতি যত্ন নিতে হবে। গাছকে ভালোবাসতে হবে। ফলদ, বনজ ও ভেষজ- এই তিন প্রকারের গাছ লাগিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করব।

আমরা আমাদের শহরকে আরো সবুজ করে তুলতে পারি। আজকাল অনেকেই শহরের বাড়ির ছাদ বাগানে ফুল-ফলের পাশাপাশি নানান রকম সবজির গাছ লাগাচ্ছে। আর গ্রাম তো সবসময়ই সেজে থাকে সবুজ রং ছড়িয়ে। নানান জাতের গাছ-গাছালি গ্রামের শোভা বাড়িয়ে তোলে। আজকাল বড়োদের অসতর্কতার কারণে গ্রামের গাছগাছালিও কাটা পড়ছে। ওদিকে নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীগুলো যেন হারিয়ে যাচ্ছে। এ সব কিছুর জন্য কিন্তু মানুষই দায়ী। আর তাই তো মানুষকে সচেতন করতে পরিবেশ দিবস আমাদের সামনে আসে পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে। যাতে করে আমরা ভুলগুলো শুধরাতে পারি।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২১ উদ্‌বোধন উপলক্ষ্যে গণভবন চত্বরে বৃক্ষের চারা রোপণ করেন

সুন্দরবনের কথাই ধরা যাক। সুন্দরবন হচ্ছে বাংলাদেশের প্রশস্ত বনভূমি। যা বিশ্বের প্রাকৃতিক বিস্ময় হিসেবে স্বীকৃত। সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশে সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি। এখানে আছে পাঁচ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ। উভচর প্রাণী রয়েছে ১৯৮ প্রজাতির। এছাড়া সরীসৃপ আছে ১২৪ প্রজাতির, ৫৭৯ প্রজাতির পাখি, ১২৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী ও ৩০ প্রজাতির চিংড়ি মাছ রয়েছে। সবচেয়ে গৌরবের প্রতীক রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি এই সুন্দরবন। চঞ্চলা হরিণীর ছোটাছুটি এই সুন্দরবনকে দিয়েছে আরো রূপবৈচিত্র্য। পরিবেশ রক্ষার কথা বলতে হলে সুন্দরবন রক্ষার কথাও চলে আসে। কারণ সুন্দরবনের সবুজ বন-বনানী পরিবেশ রক্ষায় সতর্ক পাহারা দিয়ে থাকে। গাছ-গাছালির সঙ্গে আরো যুক্ত আছে জীববৈচিত্র্য। বনের পশু-পাখিরাও আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করে চলছে।

সুন্দরবনের মতো সেন্টমার্টিন দ্বীপ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। এটি একমাত্র প্রবাল সমৃদ্ধ দ্বীপ। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ সেন্টমার্টিন এলাকায় আমরা বেড়াতে গিয়ে এমন সব জঞ্জাল তৈরি করি যা জীব-প্রাণীদের জন্য হুমকি স্বরূপ। এমন চলতে থাকলে এই প্রাণীরা একদিন অভিমান করে আমাদের সাগর দ্বীপ ছেড়ে দেবে। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে দ্বীপের সৈকতে সাইকেল, মটর সাইকেল, রিকসা, ভ্যানসহ কত কত যানবাহন চলছে। সাগর-নদীর বুকে ভাসছে প্লাস্টিকসহ নানান ধরনের বর্জ্য। চিপস্, বিস্কুট, চকলেট, চুইংগামের প্যাকেট যত্রতত্র ফেলে আমরা দ্বীপকে দূষিত করছি। এতে করে প্রবাল, শামুক, ঝিনুক, সামুদ্রিক কাছিম, তারা মাছ, রাজ কাঁকড়া, সামুদ্রিক হাঁস, সামুদ্রিক শৈবালসহ জীববৈচিত্র্য দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

পরিবেশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জলবায়ু। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন আতঙ্ক। বিজ্ঞানীরা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বলছেন, 'মানুষের নানা কর্মকাণ্ডের পরিণতিতে অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে এখন দ্রুত হারে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে এবং প্রতিনিয়ত বরফ গলছে। সেই সাথে জীবজন্তুর বিভিন্ন প্রজাতি তাদের আবাসস্থল বদলাচ্ছে'। প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায় যে, বরফের আচ্ছাদন বিলীন হওয়ার কারণে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। যার ফলে পরিস্থিতি দিনকে দিন বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে। কলকারখানার ধোঁয়া, অপরিকল্পিত নগরায়ণসহ অনেক কিছুতে মানুষ নেতিবাচক কর্মকাণ্ড করছে। যা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। আর তাই তো পরিবেশে যে বাড়তি তাপ তৈরি হচ্ছে তার ৯০ শতাংশই শুষে নিচ্ছে সাগর। সেই সাথে গলছে অ্যান্টার্কটিকার বরফ। বাড়ছে সাগর পৃষ্ঠের উচ্চতা। বরফ গলা পানি গিয়ে পড়ছে সাগরে। তাই সাগরের উচ্চতা বেড়েই চলছে। এতে করে আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে দিনকে দিন। আবহাওয়ার আচরণও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। পরিবেশবিদরা বলছেন, এর ফলে সামুদ্রিক ঝড় বেশি হবে, জলোচ্ছ্বাস বাড়বে। সাগরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে মাছ ও জলজ উদ্ভিদের উপর প্রভাব পড়বে। মাছের শরীরে বাড়বে পারদের মাত্রা। আর তাই তো পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সচেতন হতে বলছেন আমাদেরকে।

প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য এমনই- এখানে মানুষ থাকবে, পশু-পাখি থাকবে, ফল-ফলাদি থাকবে, গাছ-গাছালি থাকবে। সাগর-নদী-পাহাড় থাকবে, মাছ থাকবে। থাকবে মাথার উপর নীল আকাশ। এই আকাশ যদি কালো ধোঁয়ায় ঢেকে ফেলি, শুধু আকাশ নয়, বাতাস, প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য সবকিছুই নষ্ট হবে। তাই তো বলি, আমরা আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করব। ফুল, পাখি, প্রজাপতি গাছ-গাছালি সবার প্রতি দরদি হব। ধ্বংস করব না, সৃষ্টি করব। নষ্ট করব না, যত্ন নেব।■

লেখক: পরিচালক, শিশু একাডেমি

গাছ

মেশকাউল জান্নাত বিথী

গাছ লাগিয়ে গড়ব মোরা
সবুজের সমাবেশ
গাছে গাছে ভরে উঠবে
আমাদের সুন্দর পরিবেশ।
কোথাও মোরা পাব না তো
সবুজে ঘেরা এমন দেশ
সে যে আমাদের জন্মভূমি
প্রিয় সোনার বাংলাদেশ।

৮ম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

গল্প

জলঢাকার সোনালি দিন

সেলিনা হোসেন

গ্রামের পথেঘাটে হেঁটে সবুজ প্রকৃতির মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করার চিন্তা করে মামুন। জলঢাকা উপজেলা নামটিও ওর খুব পছন্দের। জল দিয়ে তো ঢেকে রাখা যায় না গ্রাম, কিন্তু এমন নামের মাধুর্য ওকে আবিষ্কারের সূত্র ধরিয়ে দেয়। ও প্রাণ ভরে গ্রামের সবটুকু জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখে। স্কুল বন্ধ থাকলে কোথাও না কোথাও চলে যায়। যে জায়গা দেখা হয়নি সে জায়গা দেখা ওর আনন্দের। হেঁটে যেতে না পারলে কারো সঙ্গে সাইকেলে চড়ে কিংবা গরুর গাড়িতে অথবা নৌকায়। দূরদূরান্তে যেতে ওর কষ্ট নেই, বরং না যেতে পারলে মন খারাপ হয়।

বিন্যাকুড়ি সরকারি স্কুলে পড়াও ওর স্বপ্নের জমিন। ক্লাস সেভেনে পড়ে। বাবা আবদুল জব্বার দিনমজুরি করে সংসারের জন্য আয় করে। কয় টাকাই বা আয় হয়। অভাব লেগে থাকে সংসারে। সেজন্য মাঝে মাঝে ওর মা আয়শা খাতুন মানুষের বাড়িতে কাজ করে কিছু টাকা আয় করে। এসব টাকা সংসারের জন্য খরচ না করে দুই ছেলের পড়ালেখার জন্য রেখে দেয়। বলে, যেন টাকার অভাবে পোলা দুইটার স্কুল বন্ধ হয়ে না যায়।

আবদুল জব্বার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়। বলে- হ্যাঁ, ঠিক কাজ করেছ। ওরা পড়ালেখা শিখে বড়ো হলে চাকরি করতে পারবে। তখন আমাদের অভাব থাকবে না।

– আমি অভাবের কথা ভাবি না। অভাব মাথায় করে জীবন শেষ করব। কিন্তু আমি চাই ছেলেরা পড়ালেখা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

শিখুক। নিজেরা যেন অভাবের বাইরে থাকতে পারে।

—ওহ্, ওহ্, মাগো– মাগো।

মামুন আর মাসুদ দুই ভাই হাসতে হাসতে হাততালি দেয়। তারপরে দুজনে মায়ের পায়ের কাছে বসে পড়ে, পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। আয়শা খাতুন দুজনকে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে। দইভাই মাকে আদর করে। কপালে চুমু দেয়। তারপর মামুন লাফিয়ে উঠে বলে, আমি গেলাম জঙ্গলে ঘুরতে।

—দূরে যাস না বাবা।

—পা যতক্ষণ টানবে, ততক্ষণ হাঁটব। না পারলে বসে থাকব।

মাসুদ বলে, আমি যাব তোমার সঙ্গে?

—না, তুই ছোট্ট ছেলে হাঁটবি কী করে? আমি গেলাম মাগো।

—আয়। আয়শা খাতুন জানে, ছেলেকে নিষেধ করলেও যাবে। মায়ের কথা মানবে না। সেজন্য চুপ করে থাকে। ভাবে, ও তো বনে জঙ্গলে ঘুরে। দোষের কিছু করে না। থাক, এসব দেখেটেখে বড়ো হোক। আয়শা খাতুন মাসুদের হাত ধরে দাঁড়িয়ে মামুনের দৌড়ে যাওয়া দেখে। এক সময় গাছগাছালির ফাঁকে আড়াল হয়ে যায় ও। বিভিন্ন গাছে হাত বুলিয়ে জড়িয়ে ধরে পরে আবার হাঁটতে থাকে। কখনো গাছের নিচে বসে ফড়িং খোঁজে। কখনো গাছের উপরে উঠে পাখির বাসায় ডিম দেখে।

ডিম ছাড়া পাখির বাসা দেখলে ওর মন খারাপ হয়ে যায়। প্রায়ই পকেটে চাল এনে পাখির বাসায় রেখে দেয়। যেন পাখি পেট ভরে চাল খেয়ে বাসাতে থাকে। তবে মাকে লুকিয়ে চাল আনতে হয়। কারণ অভাবের সংসার। পাখিকে চাল খাওয়ানো মা মানে না। মা ওকে ধমক দিয়ে বলে, এভাবে চাল নষ্ট করবি না। তাহলে একদিন দেখবি ভাত রাঁধতে পারিনি। তখন কী খাবি?

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে মামুন। মা তো ঠিকই বলেছে। এর কোনো উত্তর ওর কাছে নেই। তারপরও বলে, একটি পাখি ও তো না খেতে পেলে মরে যাবে।

মা হেসে বলে, পাখির খাবারের অভাব নেই। ওরা উড়তে পারে। সারা গ্রাম খুঁজে খাবার খাবে। আমরা কি জঙ্গলে খাবার খুঁজতে যাব?

—না গো মা, আমরা দোকানে চাল কিনতে যাব।

—টাকা পাবি কোথায়?

—ভাঙারির দোকানে কাজ করে টাকা আয় করব।

—বাব্বা, ছেলেটার বুদ্ধি অনেক। লেখাপড়া করে আবার দিনমজুরি করবি?

—করব, ক্ষতি কী? কাজকে আমি কাজের মতো দেখি। লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি পাব এটাও আশা করি। দিনমজুরি করে লেখাপড়ার খরচ চালাব এটা ভাবতে আমি লজ্জা পাই না। এটা আমার সাহস।

নিজের স্মৃতিতে মগ্ন থেকে আকস্মিকভাবে দেখে দুটি টিয়া পাখি ওর সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

চারপাশে পাখির কূজন। গাছের কাণ্ডে মাথা ঠেকিয়ে পা ছড়িয়ে দেয় মামুন। ভাবে, আজ এক অন্য রকম দিন। সব সৌন্দর্য ওকে ঘেরাও করে রেখেছে। ডানদিকে ছয়টা টুনটুনি লাফাচ্ছে। উড়ে যাচ্ছে অনেকগুলো কাক। কা কা শব্দে তোলপাড় করছে গাছপালা। আজ স্কুল বন্ধ, সারাদিন বনে থাকা যাবে। হঠাৎ মামুনের মনে হয় এভাবে বসে না থেকে কাজ করা উচিত। কিছু আয় করা, মানে বাবা-মাকে সাহায্য করা। কিছু আয় করা মানে যেসব ছেলে-মেয়েরা স্কুলে বেতন দিতে পারে না, তাদের সাহায্য করে স্কুলে ধরে রাখা। শিশুদের সঙ্গে সংগঠন করে গান ও নাটক করা। গ্রামের মানুষকে বোঝানো যে এইসব করা সংস্কৃতি। সংস্কৃতি চর্চা না করলে মানুষের জীবনে আনন্দ থাকে না। এত কিছু ও শিখেছে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের প্রশিক্ষণ থেকে। শিশুদের পক্ষে কাজ করা একটি বড়ো প্রেরণা ওর জীবনে। মামুন হাঁটতে হাঁটতে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে থাকে। হাসতে হাসতে বলে, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের প্রশিক্ষণ থেকে আমি তোমাদের কথা জেনেছি গাছ বন্ধুরা – পাখি বন্ধুরা। ও সবুজ ছায়ায় দৌড়াতে শুরু করে। অল্পক্ষণে পৌঁছে যায় রাস্তায়। বাবার কথা মনে হলে বুকটা কেমন কঁকিয়ে ওঠে। তিন-চার দিন ধরে বাবার জ্বর, গায়ে ব্যথা। বিছানা থেকে উঠতে পারে না। ঘরে টাকা নেই। ওষুধ খাওয়া হচ্ছে না। ধুম

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

করে দাঁড়িয়ে পড়ে ও রাস্তার মাঝখানে। ভাবে, ও তো বাড়ির বড়ো ছেলে। বাবার সেবা করার জন্য মা বাড়ি থেকে বের হতে পারে না। তাহলে ওরই তো বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। টাকা আয় করতে হবে। প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে– হ্যাঁ, এটা করতেই হবে। বাবাকে সুস্থ করতে হবে।

প্রথমে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল অফিসের সামনে আসে। এখানে যদি কোনো কাজ করা যায় তাহলে করবে। জলঢাকা উপজেলায় প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল শিশুদের নিয়ে নানা ধরনের কাজ করে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়। মামুন সব শিশুর সঙ্গে মিলে সবরকম অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকে। এজন্য সবাই ওকে ভালোবাসে। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের আলতাফ ওকে জিজ্ঞেস করে, কী রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

–আমার বাবার অসুখ। তাই কাজ খুঁজতে এসেছি। কাজ না করলে আমাদের ভাত খাওয়া হবে না কাকু।

–এখানে তো কোনো কাজ নেই রে মামুন। তোকে অন্য কোথাও কাজ খুঁজতে হবে। কাজ করলে স্কুলে যাবি কীভাবে?

–যতদিন কাজ করব, ওই কয় দিন স্কুলে যাব না।

–কেমন কথা হলো?

–আমার বাবাকে বাঁচাতে হবে তো। স্কুলের হেডস্যারের সঙ্গে কথা বলব, আমাকে যেন নতুন করে ভর্তি করে নেয়। আমি পড়ালেখা ছেড়ে দেবো না।

–ঠিক বলেছিস। শাবাশ ছেলে। আমার মনে হয় তুই ভাঙারি দোকানে যা। ওরা দিনমজুরি দেবে। তোদের ভাত খাওয়া হবে ওই টাকায়।

–ভাত খাব পরে। বাবাকে আগে ওষুধ খাওয়াব।

–হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।

–আমার স্কুলের পাশে একটা ভাঙারির দোকান আছে। আমি ওখানে যাই।

–তুই যে অনেক সামাজিক কাজ করিস তা কিন্তু করে যাবি।

–আমি কোনো কাজ ছাড়ব না কাকু। আমার চারপাশের স্কুলের যেসব ছেলেদের টাকার অভাবে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাদের আটজনকে আমি আবার স্কুলে ফিরিয়ে এনেছি। আশপাশের সব মানুষজনের কাছ থেকে একটু একটু টাকা জোগাড় করে ওদের স্কুলের বেতন দেই।

–তুই তো বাল্যবিয়ে বন্ধ করার জন্য হইচই করিস রে-

–হ্যাঁ, আমরা সব ছেলে-মেয়েরা মিলে করি। খোঁজখবর আমি রাখি। তারপর সবাইকে নিয়ে যাই। অনেক সময় গাঁয়ের লোকেরা আমাদের সঙ্গে রাগারাগি করে। কিন্তু আমাদেরকে ঠেকাতে পারে না। আমরা বাল্যবিয়ে বন্ধ করে তবে থামি। কখনো চড়-থাপ্পড় খেতে হয়। তাতে আমরা কিছু মনে করি না।

–তুই আমাদের জলঢাকা গাঁয়ের গর্ব।

–আমি যাই ভাঙারির দোকানে। সালাম কাকু।

মামুন দৌড়াতে থাকে। অল্প সময়ে পৌঁছে যায় আবদুলের দোকানে। দৌড়ানোর কারণে হাঁপাতে থাকে।

আবদুল ওর মাথায় হাত রেখে বলে, হাঁপাচ্ছিস কেন?

–আপনার কাছে দৌড়ে এসেছি। আমাকে কাজ দেন। আমি দিনমজুরি করব। আমার বাবার অসুখ। টাকা লাগবে।

–ঠিক আছে কাজ দেবো। ওখানে বসে দম নে।

শুরু হয় মামুনের দিনমজুরি। প্রথমবার টাকা পাওয়ার পরই বাবাকে নিয়ে যায় ডাক্তারের কাছে। আবদুল জব্বার ভেবেছিল, ওষুধ খেলেই ঠিক হয়ে যাবে শরীর। কিন্তু হয় না। আরো তিন-চার মাস গড়ায়। তারপর আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠে। আয়শা খাতুন ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে, বাবারে তুই লেখাপড়া ছেড়ে বাবাকে ভালো করলি। এখন স্কুলে ভর্তি হয়ে যা। ভয় নেই সংসার চলবে। আমি আয় করব, তোর বাবাও আয় করবে।

–আমিও লেখাপড়া করতে চাই মাগো।

–যা, স্কুলের হেডমাস্টারের সঙ্গে গিয়ে কথা বল।

–আজকেই যাব। আমার কাছে যে টাকা আছে তাই দিয়ে ভর্তি হব। বই খাতা কিনব।

আবদুল জব্বার সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, যা বাবা, এখনই স্কুলে যা। আর দেরি করিস না। এক বছর নষ্ট

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

হয়ে গেল।

—এই নিয়ে আমার কোনো কষ্ট নেই বাবা, আমি গেলাম। ভর্তি হয়ে আসি।

স্কুলে যেতে যেতে দেখতে পায় তিনটি ছেলে রাস্তার ধারে বসে মার্বেল খেলছে। ও কাছে দাঁড়িয়ে ধমকের স্বরে বলে- মতিন, বাবলা, পিন্টু তোরা এখানে বসে খেলছিস কেন? স্কুলে যাসনি কেন?

মতিন বলে, আমাদের বাবারা স্কুলের বেতন দিতে পারছে না। সেজন্য আমরা আর স্কুলে যেতে পারব না।

—খবরদার এমন কথা বলবি না। স্কুলে যেতেই হবে। উঠে আয়, আমার সঙ্গে স্কুলে যাবি।

—না, যাব না।

—আজকে তোদের স্কুলের বেতন আমি দিয়ে দেবো।

—তুমি কেমন করে দেবে মামুন ভাই?

—এত কথা জিজ্ঞেস করবি না। চল।

তিনজনে মামুনের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। স্কুলে পৌঁছে যায়। তখনও ক্লাস শুরু হয়নি। মামুন হেডস্যারের রুমে ঢুকে ওদের ভর্তির কথা বললে হেডস্যার অফিসকে ভর্তির নির্দেশ দেন। মামুন খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এভাবে ছেলেটির পথচলা ও নিজেকে নিজের মতো করে গড়ে তুলেছে। হেডমাস্টার ভাবলেন, কেউ ওকে শেখায়নি, কিন্তু নিজের চেতনা আলোকিত করে তোলা ওর এক অসাধারণ দিক। তিনি দেখতে পান যেসব ছেলেরা অভাবের কারণে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে তাদেরকে ও ফিরিয়ে আনে স্কুলে। সবার কাছে সাহায্য চায়। কেউ দুই টাকা দিলেও সেটা খুশি মনে গ্রহণ করে আর বলে, এই রকম অনেক দুই টাকা পেলে ওরা আবার স্কুলে ফিরে যেতে পারে। পাশাপাশি মেয়েদের বাল্যবিয়ে হলে ও প্রথমে ছুটে যায় বাবা-মায়ের কাছে। বাবা-মা রাজি না হলে জলঢাকার শিশু সংগঠনের সবাইকে নিয়ে বাড়ির সামনে স্লোগান দিতে শুরু করে, 'মেয়েদের শিক্ষা আগে, তারপরে বিয়ে'। ওদের হইচইয়ে আশেপাশের মানুষ ছুটে আসে তারপর বিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে অনেক বাল্যবিয়ে ঠেকিয়েছে মামুন। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের প্রশিক্ষণ থেকে শিখেছে বাল্যবিয়ে হলে মেয়েদের কী ধরনের ক্ষতি হয়। মায়েদের কাছে গিয়ে সে কথাও বলে। মায়েদের চোখ বড়ো হয়ে যায়। ওর মাথায় হাত রেখে বলে, বাবারে তুই আমার মেয়েটাকে বাঁচিয়ে দিলি।

মামুন হাসিমুখে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। গ্রামের সব মা ওর কাছে শ্রদ্ধার মানুষ। পায়ে হাত দিয়ে সালাম না করলে ও স্বস্তি পায় না। তাই

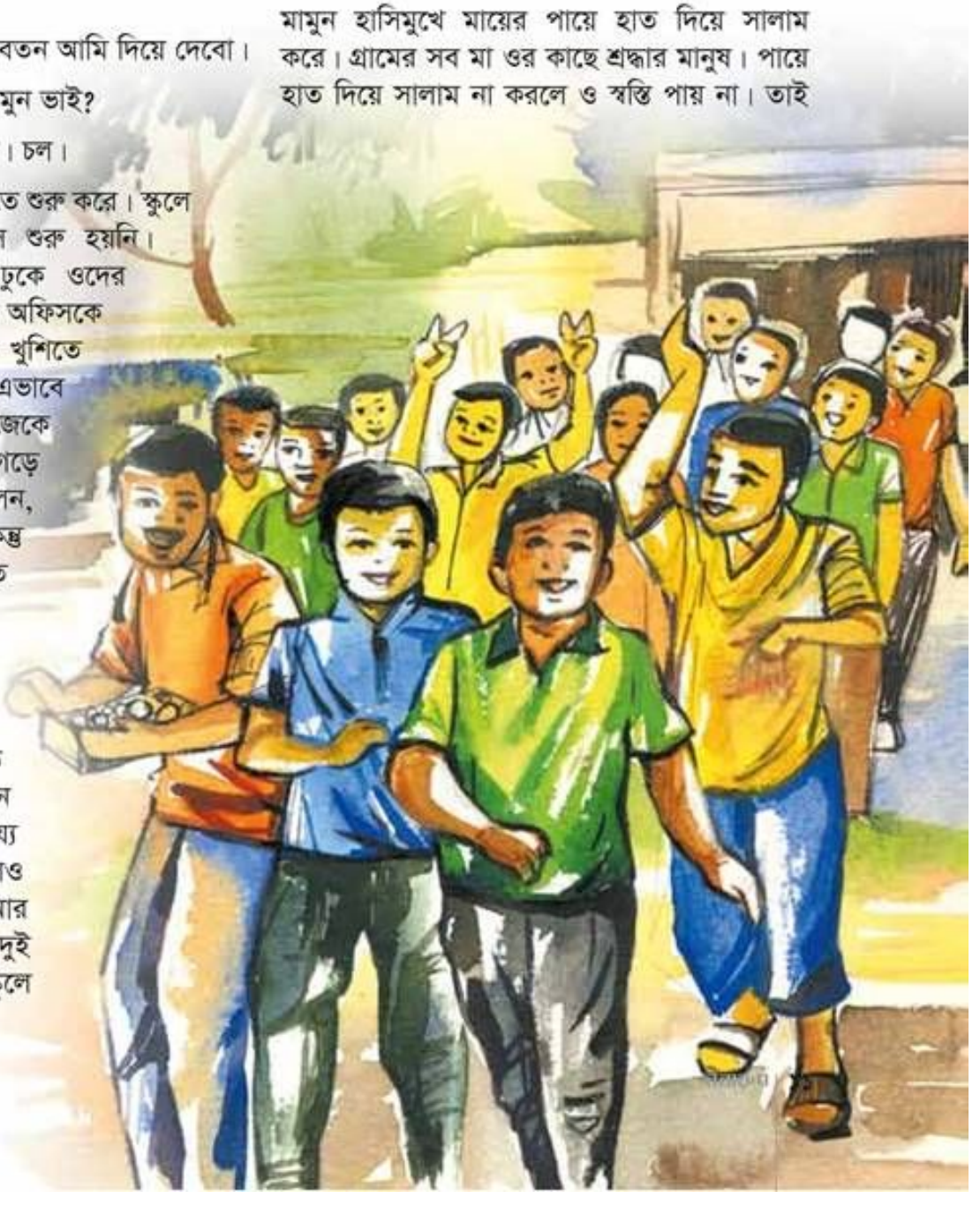

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সবাই ওকে খুব ভালোবাসে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সামাজিক কাজ করে ও চরম আনন্দে থাকে। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন ঝরে পড়া শিশুকে ও আবার স্কুলে ফেরাতে পেরেছে। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি বাল্যবিয়ে ঠেকাতে পেরেছে। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গানের আসর বসায়। গ্রামের লোকেরা খুশি হয়ে গান শুনতে আসে। সবার মুখে এক কথা, ছেলেটা আমাদের বেঁচে থাকার বাতাস দিচ্ছে। ও একদিন বড়ো মানুষ হবে। আমাদের জলঢাকা গ্রাম ওর নামে ফুটে উঠবে।

এমন চিন্তায় সবাই হাসাহাসি করে। ওর বয়সি ছেলেরা ওকে ঘাড়ে তুলে দোলাতে থাকে। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, খুশি লাগছে তোর?

—না লাগছে না।

—কেন?

—বাল্যবিয়ে ঠেকাতে গেলে রেজিনার আব্বা যে আমাকে গালাগালি করে বলল, পরে তুই কি ওর বিয়ে ঠিক করে দিবি? বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোর মাথা ভেঙে ফেলব।

—এসব কথা তো তুই অনেকবারই শুনেছিস? আবার বলছিস কেন? খবরদার আর কখনো বলবি না। তোর সঙ্গে আমরা আছি না।

আর একজন বলে, আমরা তো জানি তুই এইসব গায়ে মাখিস না। বাল্যবিয়ের চেয়ে মেয়েদের শিক্ষায় তুই অনেক বেশি গুরুত্ব দিস।

—থাক, এসব কথা বাদ দে। আর কিছু বলিস না। আমাকে ছেড়ে দে।

—না ছাড়ব না। তোকে নিয়ে জলঢাকার জঙ্গলে যাব। তোকে গাছে চড়িয়ে দেবো। তুই যা করিস তার জন্য আমাদের চেয়ে উপরে থাকবি।

—না, তোদের সঙ্গেই থাকব আমি। মিলেমিশে একসঙ্গে। আমরা সবাই সমান।

—একদম না। তোর মতো এত চিন্তা আমাদের নেই। অভাবি ছেলেদের স্কুলে পাঠাস, মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিয়ে বন্ধ করিস, আমরা তো এত কিছু চিন্তা করি না।

—থাক, চুপ কর।

—আমরা চুপ করলে কী হবে। সবাই তোর কথা বলে, সুনাম করে। তোকে পুরস্কার দেবে এমন চিন্তাও শুনি।

—থাম, থাম, চল খেলি।

মামুন জোর করে ওদের হাত ছাড়িয়ে বনের মধ্যে দৌড়াতে শুরু করে। হাডুডু খেলতে থাকে সবাই। এক সময় শেষ করে খেলা। যে যার বাড়িতে ফেরে।

বছর গড়ায়। মামুনের স্কুল-পরীক্ষা শেষ হয়। ও কলেজে ভর্তি হয়। কলেজে যায়, মাঝে মাঝে দিনমজুরি করে কলেজের খরচ চালায়। পাশাপাশি ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলে পাঠানো এবং বাল্যবিয়ে বন্ধের জায়গা তৈরি করে ফেলে। কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পর জাতিসংঘ থেকে পুরস্কার পাওয়ার খবরটি পৌঁছায় জলঢাকার সবার কাছে। চারদিকে হইচই পড়ে যায়। ছেলেরা মামুনকে ঘাড়ে তুলে লাফালাফি করতে শুরু করে। স্লোগানের মতো বলে, জলঢাকা থেকে জাতিসংঘ। জলঢাকা-জাতিসংঘ ... জ—জা— আমাদের বর্ণমালা পুরস্কার পেয়েছে। তুই পুরস্কার আনতে গেলে বাংলাদেশের পতাকার সঙ্গে জলঢাকা আর জাতিসংঘ লিখে নিয়ে যাবি। সবাইকে বলবি দেখো আমাদের বাংলা বর্ণমালা।

—থাম, থাম, এত কথা বলিস না তোরা।

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল থেকে সবাই জানতে পারে জাতিসংঘ শিক্ষা বিষয়ে তরুণদের 'ইয়ুথ কারেজ অ্যাওয়ার্ড ফর এডুকেশন' —পুরস্কার প্রদান করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেসব তরুণরা শিক্ষা বিষয়ে কাজ করে তাদেরকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বছর বিভিন্ন দেশের সাতজন তরুণকে নির্বাচিত করা হয়েছে। জাতিসংঘের 'ইয়ুথ কারেজ অ্যাওয়ার্ড ফর এডুকেশন' পুরস্কারের জন্য তাদের মধ্যে একজন মামুন আলী। যে চিঠিটি এসেছে জলঢাকায় তাতে লেখা আছে, 'প্রতিটি ছেলে-মেয়ের শিক্ষার জন্য তুমি অবদান রেখেছ। তরুণদের একজন নেতা হিসেবে আমরা তোমাকে মনোনীত করেছি। তোমাকে অভিনন্দন।'

মামুন চিঠিটা বুকে নিয়ে দৌড়ায়। ওর পেছনে যুক্ত হয় জলঢাকার অনেক শিশু। আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয় ওদের উচ্ছ্বাসের হাসি-কলরব। ওরা জলঢাকাকে বদলে দেয়, যেন জলঢাকা বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়ানো এক উপজেলা।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

পুরস্কার প্রদানের তারিখ নির্ধারিত হয়। কিন্তু মামুনের নিউইয়র্ক যাওয়া হবে না। ওর পাসপোর্ট নেই। ভিসার ব্যবস্থা করতেও সময় লাগবে। পরে ঠিক হয় যে মামুনের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করবে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের নিউইয়র্ক প্রতিনিধি।

মামুন আনন্দে একা একা ঘুরে বেড়ায় জলঢাকার সবখানে। মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ঘন ঘাসের কাছে বসে পড়ে বলে, ঘাস তোরা জানিস আমি একটি পুরস্কার পেয়েছি। জানিস কিনা বল।

হু-হু বাতাসে তোলপাড় করে ওঠে ঘাসের মাথা। মামুন হাসতে হাসতে বলে- বুঝেছি, তুই জানিস আমার ঘাস বন্ধু।

ও ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে। মাটিকে বলে, তুমি কি জানো আমি একটি পুরস্কার পেয়েছি। মাটির ওপর চিৎ হয়ে পড়ে থাকে ও। কোথাও কোনো শব্দ নেই। মাথা উঠিয়ে উঠে বসলে টের পায় পুরো পিঠের বিভিন্ন জায়গায় মাটি লেগে আছে। দুহাতে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, বুঝেছি তুমিও জানো আমার মাটি বন্ধু। যাই নদীতে নামি। তোমাকে মিশিয়ে দেবো পানিতে।

নদীর ধারে এসে দাঁড়ায়। দু-কান ভরে নদীর কলকল শব্দ শোনে। বেশ দূরে তাকালে দেখতে পায় বুলবুল যাচ্ছে। বুলবুল তার সাথে কলেজে একসঙ্গে পড়ে। মামুন আর অপেক্ষা করে না। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাঁতার কেটে অনেক দূরে যায়।

—নদী বন্ধু তুমি কি জেনেছ আমি পুরস্কার পেয়েছি?

কলকল ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে নদী। স্রোতের বেগ বেড়ে যায়। মামুন আবেগের স্বরে বলে, ভালোবাসায় আমাকে ভরে দিলে বন্ধু। আমি ধন্য হলাম।

নদী থেকে ওঠার পরে দেখতে পায় বিভিন্ন দিক থেকে ওর কলেজের বন্ধু-বান্ধবীরা আসছে। সবার আগে এসে পৌঁছেছে বুলবুল। ও বলে, তোকে অভিনন্দন জানানোর জন্য আমরা তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম মামুন। শেষে দূর থেকে দেখলাম তুই নদীর দিকে যাচ্ছিস। যারা চারদিক থেকে আসছে তারা, জয় মামুনের জয় – বলে চিৎকার করছে। তুই আমাদের গর্বের বন্ধু হয়েছিস, তোকে অভিনন্দন। হাজার হাজার অভিনন্দন। জয় মামুনের জয় ...

ছেলেরা কাছে এসে ওর ভেজা শরীর জড়িয়ে ধরে। মেয়েরা হাত বাড়িয়ে বলে, আমরা হ্যান্ডশেক করব। হাত বাড়িয়ে দেয় মামুন।

ছেলেরা সরে গেলে মামুন মেয়েদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। ওরা বলে– অভিনন্দন, অভিনন্দন – হাজারো ফুলের শুভেচ্ছা।

চল ওকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে যাই। কলেজের কাছে গিয়ে ছেড়ে দেবো। ও আমাদের গৌরব বাড়িয়েছে। বুলবুল বলে, শুধু কি গৌরব বাড়িয়েছে? আমাদের কত অভাবি সংসারের ছেলে-মেয়ের পড়ালেখার ব্যবস্থা করেছে। কত মেয়েদের বিয়ে বন্ধ করে স্কুলে ফিরিয়েছে। মেয়েরা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, চল ওকে মিষ্টি খাওয়াই। ওর সঙ্গে আমরাও খাবো।

তাই চল, তাই চল।

তোদের কাছে টাকা আছেরে বান্ধবীরা?

কিছু কিছু আছে। সবাই মিলে দিলে হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, আমরা সবাই মিলে দিব। আমাদের পকেটেও টাকা আছে।

হিপ, হিপ হুররে – চল, চল।

এই কেউ আমাকে ঘাড়ে উঠাবি না। আমি হেঁটে যাব।

কোনো কোনো ছেলে আগে আগে দৌড়াতে থাকে। চিৎকার করে বলে, হিপ, হিপ – হুররে। জয় মামুনের জয়।

ওদের সঙ্গে যুক্ত হয় গ্রামের অনেক ছেলে-মেয়ে। পেছনে হাঁটে বড়োরাও। গ্রামবাসী এমন একটি মন মাতানো দিন তো আগে দেখেনি। সবাই মিলে বাজারের মিষ্টির দোকানের সামনে আসে। তিনটি মিষ্টির দোকান ঘিরে দাঁড়ায় ওরা। গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জব্বার মিষ্টির দোকানের মালিকদের বলেন, আপনাদের সব মিষ্টি ছেলে-মেয়েদের কাছে দিয়ে দেন। ওরা গ্রামবাসীকে একটা করে মিষ্টি খাওয়াবে। মিষ্টির দরদাম হিসাব করে আমাকে বলবেন, আমি সবার কাছ থেকে পাঁচ টাকা করে নিয়ে দাম মিটিয়ে দেবো। আসুন, আমরা সবাই মিলে জলঢাকার সোনালি দিন পালন করি। আমাদের উপজেলা বিশ্বের সামনে পৌঁছে গেছে।

আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই বলে, সোনালি দিনের উৎসব মিষ্টি ছাড়া হবে না। গ্রামবাসী সবাই

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

একটা করে মিষ্টি খাবে এটা ভাবা যায়? আজ সেই দিন আমাদের। এখন রমজান মাস চলছে। আমরা ইফতারের সময় মিষ্টি খাব। ছেলে-মেয়েরা এখন খেয়ে ফেলুক। ওদের আনন্দের শেষ নেই।

যারা রোজা আছেন, তারা সবাই চলেন মসজিদে যাই। সবাই খেয়াল করবেন সবার হাতে যেন একটা করে মিষ্টি থাকে। কেউ যেন বাদ না পড়ে। উৎসবের আনন্দ সবার জন্য সমান থাকবে।

চেয়ারম্যানের কথা শুনতে খুব ভালো লাগে মামুনের। ভেজা প্যান্ট-শার্ট পরে থাকা অবস্থায় দেখে কেউ ওকে শাসন করেনি। সবাই ভালোবাসার কথা বলেছে।

এরমধ্যে সবাই যে যার ঘরে ফিরতে শুরু করে। মামুন বাবা-মায়ের জন্য দুটো মিষ্টি নিয়ে ঘরে ফেরে। মায়ের মুখে মিষ্টি নিজেই দেয়, বাবার মুখেও। মাসুদ বাজারের ওখানে ছিল। মিষ্টি খেয়েছে, এখনো ফেরেনি।

উপজেলার সবাই মিলে বলে, আমরা মামুনের জন্য সংবর্ধনার আয়োজন করব। আর কয়দিন পরে আমাদের ঈদের দিন। ঈদগাহ মাঠে নামাজের পরে এই আয়োজন হবে। আল্লাহ যেন ওকে একশ বছরের হায়াত দেন, আমরা এই দোয়া করব।

তারপর ওর কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ওর গলায় অনেক ফুলের মালা দেওয়া হবে। নাচ-গান হবে। আমরা এই বছরে একটি অন্য রকম ঈদ পেলাম। এই ঈদের দিন জলঢাকার গৌরব। এই দিনকে স্মরণ করে আমরা নানারকম অনুষ্ঠান করব। এই পুরস্কারের কথা স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের বোঝাব। যেন ছেলে-মেয়েরা এই জায়গা ধরে আমাদের সমাজকে এগিয়ে দেয়। কলেজের প্রিন্সিপাল মামুনকে কাছে ডেকে বলে, সারাজীবন এমন কাজ করে নিজেকে ভরিয়ে তুলবি বাবা। এমন কাজ থেকে থেমে যাবি না। আমরা সবাই তোর সঙ্গে থাকব।

মামুন স্যারের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। দাঁড়িয়ে থাকা সবাই হাততালিদেয়। মুখর হয়ে ওঠে গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মাঠঘাট, পথপ্রান্তর, বাড়িঘর। উৎসবের আনন্দ সবখানে। ■

লেখক: শিশু সাহিত্যিক

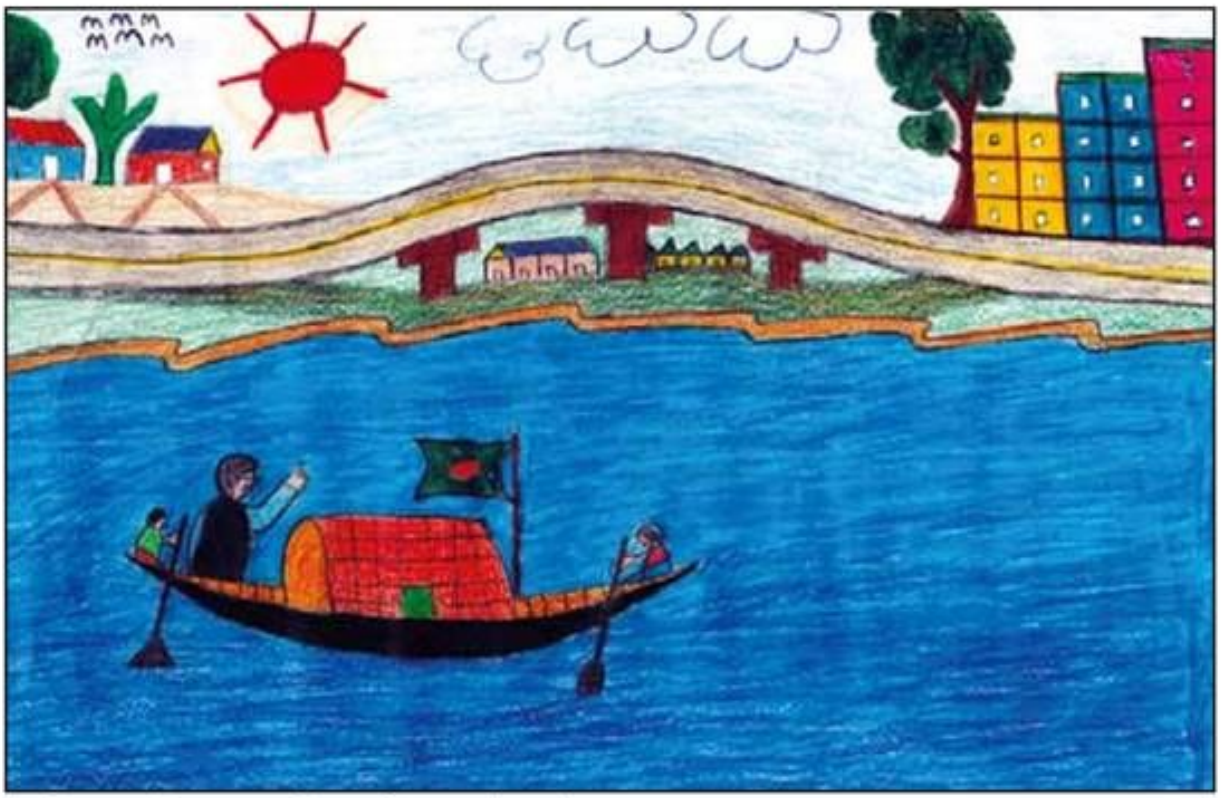

আকিফ মুতাসিম, ৩য় শ্রেণি, গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এ্যান্ড কলেজ

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবস

নুসরাত জাহান

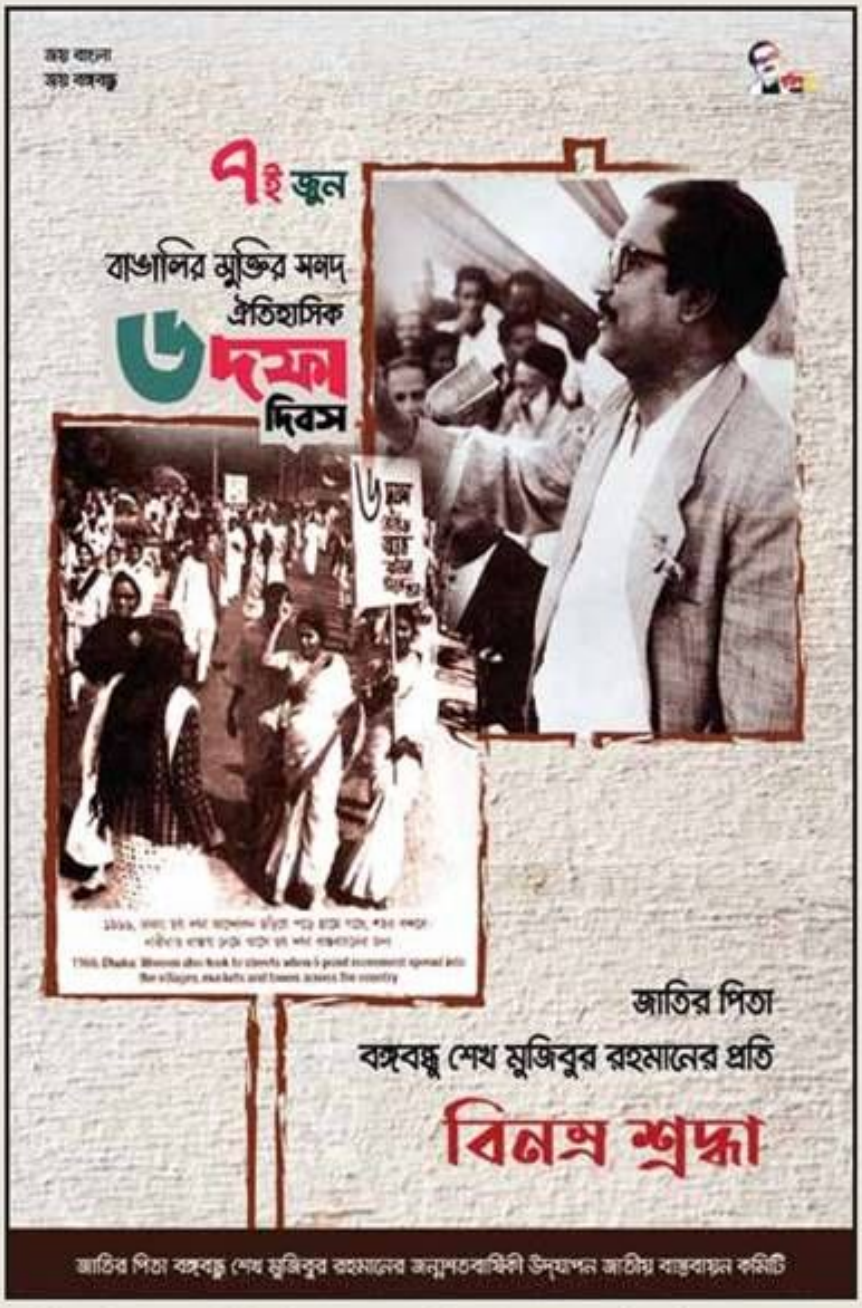

জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত বিশেষ ই-পোস্টার

ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস ৭ই জুন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল ১৯৬৬ সালের এই দিনে।

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ রাজত্ব শেষে পাকিস্তান নামে একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে স্বাধীনতা লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তান জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ রপ্তানি হতো পূর্ব পাকিস্তান থেকে। অথচ দীর্ঘ দুই দশক ধরে পূর্ব পাকিস্তানে চলে শোষণ ও নিপীড়ন। পূর্ব পাকিস্তান হয়ে পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ। দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে পূর্ব পাকিস্তানের জননন্দিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন আওয়ামী লীগের ডাকে পূর্ব বাংলায় হরতাল চলাকালে

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

পুলিশ ও ইপিআর নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি চালায়। এতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১জন শহিদ হন। ৬ দফা হয়ে ওঠে বাঙালির মুক্তির সনদ।

ছয় দফার দাবিগুলো ছিল–

১. শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি
২. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
৩. মুদ্রা বা অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা
৪. রাজস্ব কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা
৫. বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা
৬. আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা

ছয় দফার মূল বক্তব্য ছিল প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় ছাড়া সব ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি পৃথক ও সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। সরকারের কর শুল্ক ধার্য ও আদায় করার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকাসহ দুই অঞ্চলে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় আলাদা হিসাব থাকবে। পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষা ঝুঁকি কমানোর জন্য এখানে আধা সামরিকবাহিনী গঠন ও নৌবাহিনীর সদর দফতর থাকবে।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু উত্থাপিত ঐতিহাসিক ছয় দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র লুকিয়ে ছিল এই দফাগুলোর মধ্যে। পরাধীন বাঙালি জাতিকে সার্বভৌম ঠিকানার সন্ধান দিয়েছিল এই ছয় দফা। এই দাবিকে কেন্দ্র করেই পুরো জাতি একতাবদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তীতে সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি ছিনিয়ে এনেছিল দেশের স্বাধীনতা।■

নাবিহা উমাইজা জাহান, স্ট্যান্ডার্ড ফোর, গানার্স ইংলিশ স্কুল, চট্টগ্রাম

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

গুড বয় পাবলো

ঝর্ণা দাস পুরকায়স্থ

ঘড়িতে দুটো বেজে দশ মিনিট। ভরদুপুর। বাড়িতে শুধু পাবলো আর মা। জেনিফারের ভার্চুয়াল ট্রেনিং চলছে। তাই বাসাতেই রয়েছে মা, ঐ কারণেই দারুণ খুশি ছেলে। অন্যদিন সে একাই থাকে।

করোনা ভাইরাসের কারণে কত কিছু নতুন নতুন শব্দ শিখেছে। এই যেমন– মায়ের ভার্চুয়াল ট্রেনিং। ও নিজে অনলাইন ক্লাস করে, পরীক্ষাও দেয় অনলাইনে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জেনিফার উঠে দাঁড়ায়, লাঞ্চ ব্রেক এখন। টেবিল গোছাতে থাকে সে। পাবলো সবজি-ডাল আর মুরগির ঝোল ওভেনে গরম করার জন্য টাইম সেট করে দেয়। আজ ও দারুণ খুশি। রোজ একা একা ভাত খেতে বসে। বাইরের সুনসান দুপুরের দিকে তাকিয়ে খুব মন খারাপ লাগে ওর। ছেলে পছন্দ করে বলে মা চটপট ট্যাড়স ভাজি করে নিয়ে এসেছে। আজ তাই জমজমাট লাগছে বাড়িটি।

ভাজি দিয়ে ভাত মেখে মুখে দিতেই ডোর বেল বেজে ওঠে। কে এল এখন ? করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে যাবার পর যখন-তখন কেউ আর আসে না। দরজার 'ম্যাজিক আই' দিয়ে দেখে লাফিয়ে উঠে পাবলো। পাপা এসেছে, পাপা...

ঘরে পায়চারি করতে করতে পেট ডগ ককার স্প্যানিয়েলও মোলায়েম সুরে ডেকে ওঠে। ওয়েলকাম, ওয়েলকাম।

ছেলে কাছে আসতেই সুবীর চেঁচিয়ে বলেন, কাছে এসো না বাবা। একটা গুড নিউজ আছে জেনি।

মাস্ক বিন-এ ফেলে ওয়াশরুমে ঢুকে পড়েন তিনি। জেনিফার বলে, তুমি খাও পাবলো, আমি আসছি।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ফ্রেশ হয়ে টেবিলে বসেন সুবীর। পাবলো মুরগির রান চিবোচ্ছে। ছুটির দিন ছাড়া তিনজন কখনই একসাথে খায় না। আজ এক বিশেষ দিন। খেতে খেতে সুবীর বলেন, গুড নিউজটা তো বলাই হলো না। তোমার দাদু-ঠাম্মি আসছেন পাবলো। জেনিফার ছোট্ট মেয়ের মতো খুশিতে ফেটে পড়ে।

ওমা তাই ? দারুণ খবর।

সুবীর বলেন, বাবার কিছু সমস্যা হচ্ছে, চেক আপ করাতে হবে। বয়সও তো হচ্ছে তাই পেন্ডামিক সময়েই আসছেন।

ওহ- এতক্ষণে ব্যাপারটি বুঝতে পারে পাবলো। দাদু আর ঠাম্মি আসছেন। সিলেটের দ্যড়িয়াপাড়াতে দাদুর বাড়ি। ও তো মাঝে মাঝে দাদুর সাথে কথা বলে। দারুণ লাগে তখন। এখানে এলে মোটেও ভালো লাগবে না ওর।

মুরগির ঝোল দিয়ে ভাত মেখে খেতে খেতে ও হঠাৎ বেশ জোরে বলে ওঠে, নট অ্যাট অল। ভুরু কুঁচকায় মা, -কী বলছ পাবলো? দাদু-ঠাম্মি আসবে না ? এই যে তোমার ককার স্প্যানিয়েল রয়েছে, এই দ্যাখো কেমন লেজ নাড়ছে, ভালো লাগে না তোমার?

গম্ভীর গলা - ও আমার পেট ডগ।

ঠিক আছে, রাখো তোমার পেট ডগ, ওরা দাদু-ঠাম্মি, তোমার আপনজন। ওরা এলে তো তোমার খুব ভালো লাগবে সোনা।

আবার বিরক্ত গলা - নাহ্।

ধোঁয়া ওড়া গরম ভাত, মুরগির ঝোল, সবজি-ডাল, মিষ্টি, দই- সবকিছু বিস্বাদ ঠেকে মা-বাবার কাছে। মায়ের ট্রেনিং শুরু হবে এবার। কাগজপত্র গুছিয়ে কলম নিয়ে টেবিলে আবার বসে জেনিফার। মনটা খুব খারাপ লাগছে ওর। ছেলেটা অমন হলো কেন? একা থাকবে, বাড়িতে কেউ এলেই মুখভার।

একা ছিলাম বেশ তো ছিলাম নিজের বিছানায় শুয়ে, পাবলোর দারুণ লাগছে। মা মণি আর পাপা গম্ভীর হয়ে আছে। নিজের মতো সে থাকতে পারবে না? ওর যা ভালো লাগে তা সে খোলাখুলি শেয়ার করবে না!

কতদিন হয়ে গেল ইশকুল বন্ধ । অনলাইনে ক্লাস হয়, মাঝে মাঝে পরীক্ষাও হয় অনলাইনে। করোনা ভাইরাসের কারণে জীবনটাই যেন ওর বদলে গেছে। মা-বাবারা বড়ো, ওনারা তো মানিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু পাবলো যে আগের মতো ছাদে, ইশকুলের মাঠে, কিংবা মা মণি-পাপার সাথে মাঝে মাঝে রমনা পার্কে গিয়ে বল কিংবা ক্রিকেট খেলতে পারে না-সে কথাগুলো কি বড়োরা একবারও ভাবে না।

মা মণি সরকারি ব্যাংকে কাজ করে। সোয়া নয়টার দিকে যায় ওরা। শুক্র-শনিবারের জন্য ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। মা মণি কি জানতে চায় সে কথা? পাপাও তো বুঝতে চায় না। শুধু ওদের মনের মতো কিছু না হলেই গম্ভীর হয়ে থাকে দুজন।

বড়োরা ছোটোদেরকে একেবারেই বুঝতে চায় না। মা মণি আর পাপা অফিসে চলে গেলে পরে ভারি একা লাগত পাবলোর। তখন আরো ছোটো ছিল সে। অবশ্য কাজ করার জন্য বাড়িতে কেউ না কেউ থাকত। বিনিমাসি, আরজু খালা, বকুল দিদি ওরা কাজ করত। ঘরের জিনিসপত্র ডাস্টিং করার আওয়াজ, বাসন ধোয়ার ছপছপ শব্দ, মাছ ভাজার ছ্যাঁক ছ্যাঁক প্ল্যাট চারদিকে ভরিয়ে রাখত। পেয়াঁজ কুচি আর পাঁচফোড়ন দিয়ে ডাল রাঁধার সময় খুব কাশত পাবলো। রেগে বলত, তোমার ডাল রান্না বন্ধ করো তো বিনিমাসি। বিনিও জবাব দিত, ডাল ছাড়া তুমি তো খেতে পারো না বাবা।

তখন অবশ্য পুরো সময়টা বাসায় থাকতে হতো না। ইশকুল থেকে ভ্যান গাড়ি এসে ওকে নিয়ে যেত, বাড়িতে আবার ফিরে আসত ভ্যান গাড়িতে করেই।

এমনই করে একটু একটু বড়ো হচ্ছিল সে। বিনিমাসি বা বকুলদি সংসারের কাজ করত, রান্না করে খেতে দিত, তবে মা মণি আর পাপা কাজে বেরিয়ে গেল নিজের বইপত্র-খাতা-রং পেনসিল নিজেই গুছিয়ে নিত। বরাবরই সে একা। মা মণি মাঝে মাঝে খুশি মাখা গলায় বলত, এই তো পাবলো নিজে নিজে সব কাজ করতে পারে। একা একা বড়ো হলে তো সব কাজ শিখতেই হবে।

বছর খানেক আগে ঠাম্মি এসেছিলেন। তখন বলেছিলেন, যাদের মায়েরা চাকরি করে ওরা তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে যায়। সবকিছু বুঝতে শিখে, ওরা নিজে নিজে চলতে পারে, অন্যের সাহায্যের দরকারই পড়ে না।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

তা সত্য। মা মণি হটপটে খাবার রেখে যায়। ও ইশকুল থেকে ফিরে একা একাই খায়। টেবিলে তেলাপোকা দেখতে পেলে কাগজে লিখে রাখে- মা মণি টেবিলে তেলাপোকা ছিল। ডাইনিং টেবিল ভালো করে মুছতে হবে।

মা মণির ফিরতে ফিরতে দেরি হয়, ও তখন ঘুমিয়ে থাকে, মাসি কিংবা বকুলদি ডোর বেল বাজালে দরজা খুলে দিত।

করোনা ভাইরাসটি দুমদাম আসার পরেই অন্যরকম হয়ে গেল সব । বড়োরা খবরের কাগজ পড়ে ভাবনায় পড়েছেন, পাবলো নিজের মতো করে ভেবেছে অসুখ আর কদিন থাকে? দু-চার মাস পর উধাও হয়ে যাবে কোভিড-১৯। হ্যালো করোনা-শুনতে পাচ্ছ তুমি?

তা তো হলোই না, ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত দিশেহারা সবাই। থামছেই না অসুখ বরং আজকাল বেড়েই চলছে। মা মণি ছাড়িয়ে দিলেন বকুলদিকে। ও বাইরে থেকে আসে, বিকেলে বা সন্ধ্যায় বাড়িতে ফেরে। করোনার জীবাণুকে তো দেখা যায় না, হয়ত বকুলদির শরীরেই ভাইরাসটি চলে এল।

খুব আদর করে বড্ড মিষ্টি করে মা বলেছিল অসুখটা কমলে আবার তুমি আমাদের বাড়ি কাজ করবে কেমন বকুল? অসুখের জন্যই না ছাড়তে হচ্ছে। অসুখ কমে গেলে তোমাকে মোবাইল করব। চলে এসো। মা মণি কাঁদল, বকুলদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। ফাঁকা হয়ে গেল বাড়িটা।

এরপর থেকেই তো পাবলো একেবারেই একা।

এ্যাই পাবলো- ফ্রিজটা বারবার খুলছ কেন?

- আজ তুমি অনেক চকলেট আর চুইংগাম খেয়েছ? মা অফিস থেকে এলে বলে দেবো।

- তুমি কিন্তু অনেকবার কোক খেয়েছ, এরপর জ্বর-কাশি হলে কে দেখবে শুনি ?

বকুল দিদি যাবার পর বাড়িতে শাসন করার আর কেউ নেই। বিনিমাসিও এমনই চোখ পাকিয়ে কথা বলত। দুজনের ওপর একরাশ রাগ ছিল ওর। শাসনও যে কত মিষ্টি হয় এখন বুঝতে পারছে সে।

একদম একা ও - কথাটি ভুল। পাশে রয়েছে স্প্যানিয়েল কুকুর। সারাদিন ঘরে পায়চারি করে নাদুসনুদুস রকি। তুলোর মতো নরম পশম সারা শরীরে। কুতকুতে দুটি চোখ। রকিটা খুব দুষ্টু।

পাবলো আর রকি- বেশ আছে দুজন। মা মণি আর পাপা দুজনেই অবাক। মনে মনে ওরা বিরাট এক ধাক্কা খান, ছেলে যখন বলে, এখন দাদু আর ঠাম্মি আসার দরকারটা কী শুনি ?

সুবীর অবাক হয়ে বলেন- বাবার বয়স হয়েছে, চেক আপ করাতে হবে না ?

বাড়ি থেকে কেউ আসবে, ফাঁকা বাড়ি জমজমাট হয়ে উঠবে- এসব ভেবে কি এখনকার বাচ্চারা খুশি হয় না! এ কেমন কথা। দিনকাল কি একেবারেই পালটে গেছে?

তিন বেডরুমের ফ্ল্যাট, তিনটে ব্যালকনি, তিনটে ওয়াশরুম, ডাইনিং স্পেসটা অনেক বড়ো। দুজন আপনজন এলে এইটুকুন ছেলের তো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

পাবলো ভাবে অন্য কথা। করোনা ভাইরাস আসার পর থেকে অন্য রকম জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও। এ কামরা থেকে ও কামরা রকির সঙ্গে ছুটোছুটি করে। এ বিছানা থেকে ও বিছানায় গড়াগড়ি খায়। সময়মতো অনলাইনে ক্লাস করে, পরীক্ষা দেয়। এখন অন্য রকম রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। ক্লাস ফাইভ-এ পড়া এগারো বছরের পাবলো আপন মনে গান গায় - 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও'।

সত্যি নিজের ইচ্ছেমতো থাকতে কী যে ভালো লাগে। এর মাঝে দাদু-ঠাম্মি আসবে কেন ? করোনা ভাইরাসের জন্য অন্য অসুখ তো আর বসে নেই।

সমরেশের হার্টের প্রবলেম, চোখেও সমস্যা রয়েছে। ঠাম্মির শরীরে আর্থাইটিজের ব্যথা। ওরা এলেন, পাবলো দূরে দূরেই রইল। দুজন মানুষ আসাতে ফ্ল্যাটটি গল্প-কথা আর রান্নায় গমগমে হয়ে ওঠে। নাতিকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে যান, পাবলো ধরা দেয়না। দূরে দূরে থাকে, দাদু-ঠাম্মির কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

মা-বাবাকে নানান পরীক্ষা করে ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধপত্র এনে সুবীর নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, নিয়ম করে ওষুধ খেও বাবা। তুমিও শরীরের যত্ন নিও মা।

ছুটির দিন, শুক্রবার। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে সেকেন্ড রাউন্ড চা খেতে খেতে সমরেশ বলেন, পাবলো, ও পাবলো- আমার দাদু ভাই কোথায়?

সুবীর বলেন – ও তো ঘুমোচ্ছে।

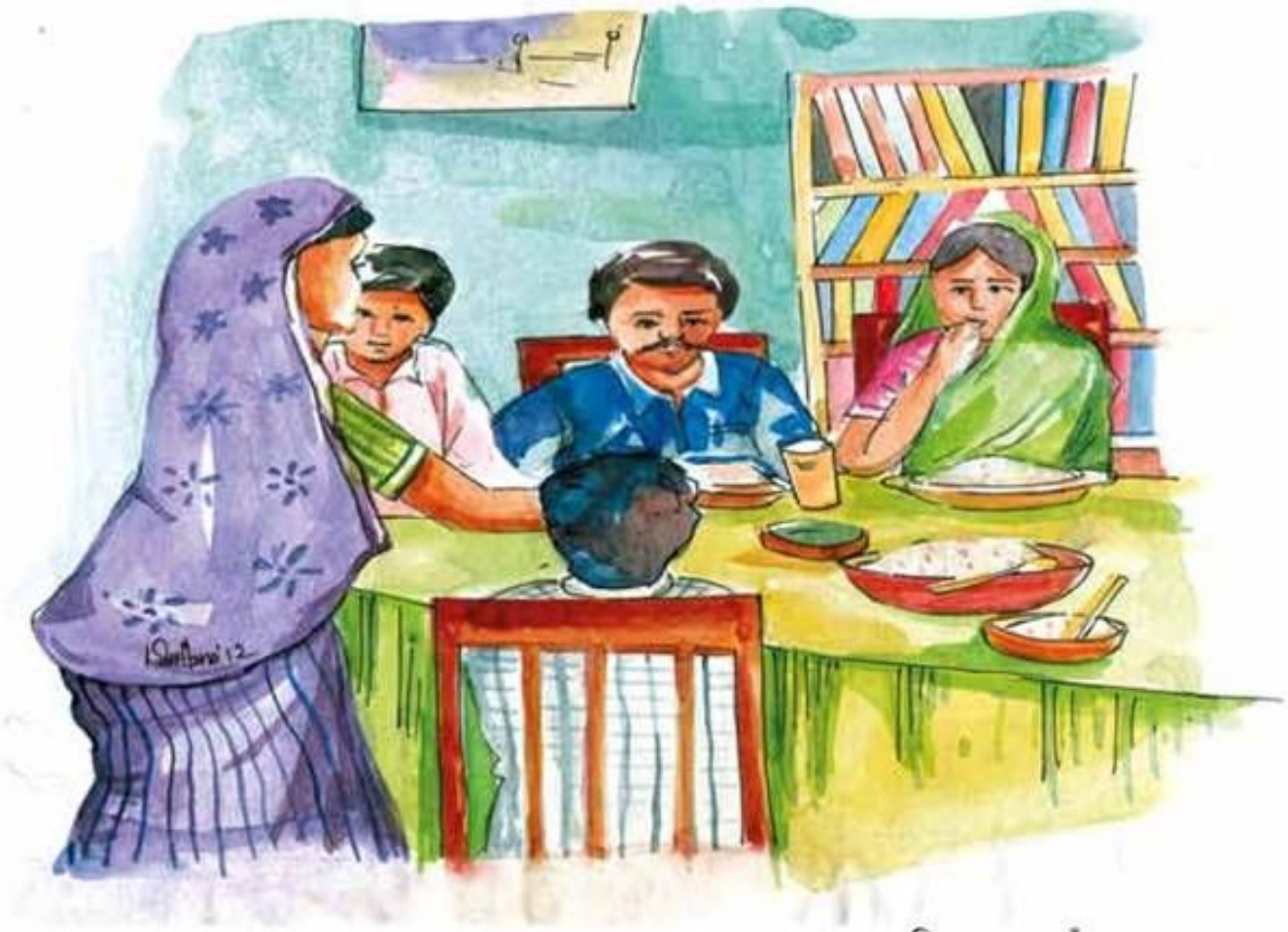

তোমার দাদু বলত–'ভোরের বাতাস লাগলে গায় সকল অসুখ দূরে যায়'।

মুখ ঢেকে দেওয়া কাঁথাটি সরিয়ে নাতি বলে, এখন বাইরের বাতাস গায়ে লাগালে কী হয় জানো? করোনা ভাইরাস শরীরে এসে জাপটে ধরে।

দাদু বলেন, না-দাদুভাই, করোনা কিন্তু একজন মানুষের শরীর থেকে অন্য মানুষের শরীরে ঢুকে। পাবলো বলে, ওয়েট আ বিট দাদুভাই, তোমার এই

-সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ঘুম ? বলিস কি রে? জেনিফার বলে স্কুল তো নেই বাবা, তাই ঘুমিয়ে থাকে। মনিকা বলেন, এটা তো কাজের কথা হলো না জেনি। স্কুল নেই বলে ভোরে উঠবে না ?

শুয়ে শুয়ে সবই শোনে পাবলো। কথা বলে চুপ করে বসে থাকেন না ঠাম্মি। ওর কাছে এসে মিষ্টি করে বলেন, জানিস পাবলো তোর পাপা যখন ছোটো ছিল, ওর বিছানার পাশের জানালা খুলে দিয়ে

কথার অ্যানসার আমি দেবো। দাঁত ব্রাশ করে আসি।

সুবীর আর জেনিফার তাকিয়ে থাকে ছেলের দিকে। দাদু-ঠাম্মির কাছাকাছি না এসে একা একা থাকলে তো সোশ্যাল হবে না ছেলে। কারো সাথে মিশতে পারবে না। ভেরি ব্যাড পাবলো, ভেরি ব্যাড। হরলিকসের পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দেয় সে।

জানো দাদু ভাই, আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের তিন

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

তলায় তোমার বয়সি এক দাদু থাকেন। ওনার ছেলে-মেয়েরা কানাডা আর অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। করোনার জন্য উনি মর্নিং ওয়াক-এ যান না। একটি লোক এসে বাজারহাট করে দিয়ে যায়। মুখে মাস্ক পরে থাকেন, একটু পর পর উনিশ-বিশ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেন। এরপরও সেই দাদুর করোনা হলো কী করে- বলো তো।

সমরেশ বলেন, এটি এমনই এক বাজে ভাইরাস, কী করে যে মানুষের শরীরে ঢুকে যায় কেউ জানে না। গবেষণা চলছে। এখন বলছে মানুষের কাছাকাছি এলে করোনা অ্যাফেক্ট করে, সেজন্যই মাস্ক পরা। এটি বাতাস বাহিত রোগ নয়। এরপরও দ্যাখো শুধু আমরা কেন অনেকেই দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখেন। দুষ্ট ভাইরাস যদি চলে আসে। কেউ জানে না ভাইরাসটি কী করবে। তবে আফ্রিকান করোনা নাকি বাতাস বাহিত রোগ।

ড্যাবড্যাব চোখে রকি একমনে কথা শুনছে। ও হো হো হো করে আওয়াজ করে। দাদুর কথায় ও সায় দিচ্ছে। সমরেশ জিজ্ঞেস করেন, এটাকে স্প্যানিয়েল কেন বলে জানো? পাবলো বলে, আবার কোয়েশ্চেন দাদুভাই? স্পেন দেশের কুকুর তো তাই ওকে স্প্যানিয়েল বলে।

-দাদু, ওকে তুমি কুকুর বলবে না। তোমরা কিন্তু সবাই ওকে রকি বলবে, কারণ ও আমার পেট ডগ। মনিকা বিরক্ত হয়ে বলেন, শুধু রকি কেন, তোমার পেট ডগকে আমি মি. রকি ডাকব। সারাদিন এ ঘর-ও ঘর করে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায়। বড়ো বিরক্তিকর বাপু।

সমরেশ বলেন, দ্যড়িয়াপাড়ার বাসায় বড়ো বারান্দা, উঠোনে খোলামেলা জায়গা রয়েছে। কিন্তু এখানে মি. রকি এ ঘর-ও ঘর না করে কী করবে বলো।

কথাটি তো ঠিক। দাদু ভাইয়ের সাপোর্ট ভালোই লাগে পাবলোর। মনে মনে বলে, বুড়ো দাদু তো বেশ ভালোই লোক। স্প্যানিয়েলের খবর রাখেন, কত কিছু জানেনও।

খুশি ভরা সুরে পাবলো বলে, তুমি অনেক কিছু জানো দাদুভাই। ইউ নো এভরিথিং। মুখ ভরে হেসে সমরেশ বলেন, সবকিছু জানি না,তবে কিছুটা জানি।

গুটিগুটি পায়ে পাবলো আসছে।

আসছে, নাতিটা গুটিগুটি পায়ে কাছে আসছে, প্রথম যেমন ওদের দেখে মুখ ভার করে থাকত, এখন আর ততটা নেই।

আজ শনিবার। জেনিফারের কাছে ছেলের প্রশ্ন- মা মণি, রকিকে কি কর্নফ্লেক্স বিস্কিট দিয়েছ?

মনিকা বলেন, সব দেওয়া হয়েছে, তুমি এবারে পড়তে বসো। যাবার আগে একটা কথা শুনে যাও ভাই।

- বলো কী বলবে।

- মি. রকি দুধ খায়, মাটন কিমা, বিস্কিটও খায়, আবার পেঁপে, কাঁচাকলা, বিন ও গাজর সেদ্ধ করেও দেওয়া হয়। ওটাও খায়।

-কী বলছ ঠাম্মি, রকি ব্যালেন্স ডায়েট খাবে না?

- ঠিক আছে, তোমার পেট ডগ সুষম খাবার খাবে, তোমার খেতে হবে না? তুমি তো সবজি একেবারে খাও না। করলা, শিম-বেগুন ভাজি ওগুলো তো ছুঁয়েই দেখো না। সবাই কী বলবে জানো? ঐ দেখো, নাদুসনুদুস রকির মালিককে দেখো, উনার নাম হলো মি. তেজপাতা।

সবাই খলখল করে হেসে উঠে। সুবীর বলে, মা তোমরা থাকায় বাসাটা গমগম করে। অফিসে গেলে কোনো ভাবনা হয় না পাবলোর জন্য, জানি তোমরা সব সামলে নেবে। জেনিফার বলে, আরও কয়েকটা দিন থেকে যান মা।

মনিকা ভাবেন, ছয়-সাত দিন থাকা এমন কোনো ব্যাপার নয়। দ্যড়িয়াপাড়ার বাড়িতে পুরনো দেখভালের লোক আছে, ও সব সামলে নিতে পারে।

মনিকা বলেন, এখনকার বাচ্চারা অনেক বেশি ম্যাচিওর। যে-কোনো ব্যাপার অ্যাকসেপ্ট করার ক্ষমতা অনেক। ল্যাপটপ চালাতে পারে, এক পলকেই মেইল করতে পারে, মোবাইল দিয়ে ওরা কত কিছু করে। আমি আর তোমাদের বাবা অফ-অন ছাড়া কিছুই করতে পারি না।

পাবলোর বুকের ভেতর আনন্দের সাগর টগবগ করে ফুটতে থাকে। যাদেরকে ও আসতে মানা করেছিল,

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ওরা তো দারুণ ভালো। পাবলোর ফেভারে কথা বলছেন ঠাম্মি আর দাদুভাই।

সুবীর আর জেনিফার বাড়িতে নেই। দুজনেই অফিসে। বিছানায় চিতপাত হয়ে পাবলো গাইছে-

'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও'।

রকিটা এমন দুষ্টু মনিকার শাড়ির কুচি নিয়ে খেলছে। মনিকা কাজ করতে করতে বলেন, তোমার মতো তুমি কেন থাকবে ? সবাইকে নিয়ে মানিয়ে গুছিয়ে থাকতে হয়। চটপট জবাব নাতির- একেবারে ছোটোবেলা থেকেই আমার এমন অভ্যেস হয়ে গেছে। সাড়ে সাতটায় মা মণি নয় তো পাপা স্কুলে দিয়ে আসত।

- কী খেয়ে যেতে শুনি?

- ডিম-পাউরুটি আর বাটার।

- রোজ একই খাবার ভালো লাগত?

- মা মণি তো সময় পেত না। ভালো না লাগলেও খেতাম ঠাম্মি।

একটু একটু করে বেশ অনেকখানি ভাব হয়ে গেছে এই কদিনে। প্রথমে দাদুভাই আর ঠাম্মিকে দেখলে চুপ হয়ে যেত, এখন বুকের জমানো কথাগুলো উজার করে দেয় দুটি মানুষের কাছে।

-মাঝে মাঝে বকুলদি আসত না, সেদিন ওভেনের চাবি বন্ধ আছে কিনা স্কুলে যাবার আগে চেক করতাম। দরজা-জানালা বন্ধ করে বই গুছিয়ে দরজা লক করে তবেই স্কুলে যেতাম। এইটুকুন ছেলে, একা একা থাকে। ভেরি ব্যাড। মনিকার বুকের ভেতর থেকে করুণ নিশ্বাস ভেসে আসে,

- আহারে।

সমরেশ শক্তপোক্ত মানুষ। ভারি গলায় বলেন, একা একা থাকে বলে অনেক দায়িত্ব নিতে শিখে গিয়েছে পাবলো।

দাদুর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে ঠাম্মি চাপা গলায় বলেন, আমাদের পাবলো ডিস্টার্বড চাইল্ডহুডের মধ্যে দিয়ে গেছে। একটা অ্যাবনরমাল সিচ্যুয়েশন ছিল। সব নরমাল হবে, একটু সময় দাও প্লিজ।

-গেস্ট এসে কি মানুষের বাড়িতে এতদিন থাকে!

পাপা বলে, ওরা কি গেস্ট? ওরা তোমার আপনজন।

জেনিফার ফিসফিস করে বলে— ছি ছি পাবলো, একা থেকে কী হয়েছ তুমি? বাড়িতে কেউ এলে অ্যাডজাস্ট করে থাকতে হয়।

- নাহ, আমি একা একাই থাকতে চাই। ছেলের বুকের ভেতরে রাগ আর ভাবের রং বদল চলছে।

পাবলো এখন রকির সাথে খেলছে।

- দেখেছ দাদু, কেমন হাউস ট্রেনিং দিয়েছি রকিকে। নাম ধরে ডাকলেই কাছে চলে আসে। আমি যখন বলি 'সিটডাউন' সঙ্গে সঙ্গে বসে যায়। এই দেখো, বল মুখে করে নিয়ে আসছে।

মনিকা বলেন, তোমারও তো হাউস ট্রেনিং দরকার দাদু। তোমার স্প্যানিয়েল সেরেলাক- কর্নফ্লেক্স খায়, দুপুরে মাটনের কিমা, ভাত, সবজি সব খায়, তোমাকেও তো দাদু সব খেতে হবে। তুমি রকিকে দুধ খাওয়াও, পনির-ব্রেডও খায় রকি। তুমি খাও শুধু ডাল আর চিকেন। সবজি একেবারেই খাও না, আর মাছ?

- মাছে অনেক কাঁটা।

- কাঁটা বলে মাছ খাবে না? কাঁটা বাছা শিখতে হয় খেতে খেতে। তুমি বড়ো হবে কী করে? দোকানে অর্ডার দাও, এটা কোনো কাজের কথা হলো পাবলো? ঠিক আছে শোনো।

নাতি তাকিয়ে থাকে ঠাম্মির মুখের দিকে। মনিকা বলেন, যে কদিন থাকব রোজ তোমাকে মাছের ফ্রাই, মাছের ঝোল করে খাওয়াবো।

- আমি কাঁটা বাছতে পারি না ঠাম্মি, কী করে খাব?

- আমি তোমাকে খাইয়ে দেবো। একটাও কাঁটা থাকবে না।

- তুমি ম্যাজিক জানো নাকি ঠাম্মি ?

- হ্যাঁ জানি তো

চিকেন বার্গার, চিকেন স্টেক, পিৎজা, হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি, আচারি পোলাও কী করে খাস রে?

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ভাল্লাগে খেতে ?

- হ্যাঁ, ভালো লাগে তো।

সবার সাথে মিলেমিশে খেতে চাই পাবলো শুয়ে আছে খাটে, তার পাশেই শোবেন মনিকা, শেষ দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে মনিকার। পাবলো যে শুধু একা থাকে তা নয়, করোনা ভাইরাস এসে ওদেরকে আরো একা করে দিয়েছে। হ্যাঁ, রকি ওর সঙ্গী হয়েছে সত্যি কিন্তু কোনো মানুষ, বন্ধু, স্কুলের সাথি, পরিবারের লোকজন কারো সঙ্গে সে বেড শেয়ার করবে না, খাবার শেয়ার করবে না - এ কেমন প্রজন্ম! যখন খুশি খাবার অর্ডার দাও, ইচ্ছেমতো খাও, প্যাকেট বিন-এ ফেলে দাও।

চুপি চুপি এসে পাবলোর পাশে শুয়ে পড়েন মনিকা। নাতি কৌতূহলে জিজ্ঞেস করে-ঠাম্মি, কালকে মাছের ফ্রাই তৈরি করবে তো! সত্যি বলছ, কাঁটা থাকবে না।

- নারে থাকবে না দেখিস।

- শোনো দিদা, আমি যখন আরো ছোটো ছিলাম ডিম-পাউরুটি খেয়ে স্কুলে যেতাম, আমাদের টিফিন হতো দশটায়। সবার মায়েরা হটপটে ভাত, তরকারি নিয়ে আসত। চোখ বড়ো বড়ো করে ঠাম্মি বলেন, তারপর?

- ওদের মায়েরা মেখে খাইয়ে দিত। ওরা ইয়া বড়ো হাঁ করে খেতো। চুপ করে থাকেন মনিকা। জানেন, জেনিফার তখন অফিসে যাবার জন্য রিকশা খুঁজছে। ঠিক সময়মতো না পৌঁছালে লাল কালির দাগ বাড়বে খাতায়।

- ঘুমোলে নাকি ঠাম্মি ?

- নারে, আমি তো শুনছি।

- আমি কী করতাম জানো।

- কী করতে ?

- ক্যান্টিনের সামনে ঘোরাঘুরি করতাম। ওপরের ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের ভিড়, ওরা বার্গার, পিৎজা আর কোল্ড ড্রিংক্স কিনত। আমি ছোটো তো, ওদেরকে ডিঙিয়ে ক্যান্টিনের ভেতরে যেতে পারতাম না। দূর থেকে দেখতাম গরম গরম সিঙারা-সমুচা সাজানো, খেতে ইচ্ছে করত ভীষণ।

পুঁচকু নাতিটার কথা শুনে মনিকার বুকের ভেতরটা গলে যেতে থাকে। সমরেশও বসে বসে শুনছেন, দুপুরে উনি ঘুমান না। পাবলো বলতে থাকে, ক্লাসে ফিরতেও পারতাম না। মায়েরা খাইয়ে দিচ্ছে আমার ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের। মনে হতো, আমার মা নেই, কেউ নেই।

সমরেশ মনে মনে উচ্চারণ করেন - সত্যি নাতিটার শৈশবটা বড়ো এলোমেলো কেটেছে। বড়ো একা, নিঃসঙ্গ সে।

দাদুর মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে ঠাম্মি বলেন, পাজি করোনা ভাইরাসটা চলে গেলে সব নরমাল হয়ে যাবে। তখন পাবলো আবার স্কুলে যাবে, সবার সাথে মেলামেশা করবে। এখন অনেক বড়ো হয়েছে বুদ্ধিও হয়েছে অনেক। মা মণি আর পাপা বলবে না- ভেরি ব্যাড ভেরি ব্যাড পাবলো।

রকি গানের সুর ধরার মতো ও হো হো হো করে গেয়ে ওঠে।

ও যেন বলে, তুমি যা বলেছ, সব সত্যি ঠাম্মি। হি ইজ আ গুড বয়।

শুক্রবার ছুটির দিন। সবাই বাড়িতে। দু-তিন রাউন্ড চা হয়ে গেছে, এলেবেলে কত গল্প। ছুটির দিন বলে রকিও ছুটাছুটি করছে অনেক। জেনিফার প্রেসার কুকারে মুরগির ঝোল রাঁধছেন।

পাবলো মাংস ছাড়া কিছুই খায় না। মনিকা বলেন, জেনি, তুমি রুই মাছের বড়ো পিস দাও তো। পাবলোর জন্য ফ্রাই করব।

- ও মাছ একেবারেই খায় না মা।

- তা হোক, আজ একবার ট্রাই করে দেখি।

সবার জন্য কফি তৈরি করতে করতে জেনিফার আপনমনে বলে, আপনারা ছিলেন মা কী যে নিশ্চিন্ত ছিলাম। পাবলোর জন্য একটুও ভাবতাম না।

আমাদের অফিস থেকে আসার সময় হলেই আপনি গিজার চালিয়ে দিয়েছেন, চা তৈরি করেছেন। বাবা গল্প করে বাড়িটাকে ভরিয়ে রেখেছেন। বাবার হো হো দিলখোলা হাসিতে সারা ফ্ল্যাট গমগম করত।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

মনটা ভার হয়ে গেল সবার। দু-দিন পর সকালবেলার ট্রেনে বাড়িতে ফিরে যাবেন ওরা। দুপুরে সবাই খেতে বসেছে। শুধু নাতিটাই নেই।

সমরেশ জোরে ডাকেন, এ্যাই পাবলো - খেতে এসো। আমরা বসে আছি কিন্তু। বেডরুম থেকে চেচিয়ে পাবলো বলে, আমি ঠাম্মির কাছে খাবো।

ঠাম্মি মাছের ফ্রাই দিয়ে ভাত মাখছেন।

-হাঁ করো হাঁ করো পাবলো, হাঁসের ডিম খাও। খাচ্ছে সে, ঠাম্মি মাছ দিয়ে, কখনও সবজি দিয়ে মাখিয়ে দিচ্ছেন আর গপাগপ খেয়ে নিচ্ছে।

- বাহ্, দারুণ তো, মাছের কাঁটা কোথায় গেল ঠাম্মি? ভ্যানিস করে দিলে?

মনিকা বলেন, আমি তো ম্যাজিক জানি রে।

- তাই হবে ঠাম্মি। এমনই করে হাঁসের ডিম, কবুতরের ডিম বানিয়ে ওদের মায়েরা বন্ধুদের খাওয়াত। ভাতের দলা মাখিয়ে এই যে খাইয়ে দিচ্ছ ঠাম্মি, এটাকে কী বলে?

- বলে, ভাতের গ্রাস।

- গারাস? আমি বলতেই পারছি না।

- পারবি কী করে রে বোকা ? শব্দটাই তো শুনিসনি কোনো দিন।

- ওর অন্য নাম নেই? আমার বাড়িতে নাম পাবলো, স্কুলের নাম মুকুট।

- খাও খাও তাড়াতাড়ি। এবারে হলো ঘোড়ার ডিম।
- ঠাম্মি, ঘোড়া ডিম পারে নাকি? ইউ আর লায়িং ঠাম্মি। নাতির কথা মেনে নিলেন মনিকা।
- হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মিথ্যে বলতে হয় তো।

তবে গ্রাস এর অন্য একটি ইজি নাম আছে।

- বলো।

- এটাকে বলে লোকমা।

- লোক আর মা, দুটোতে মিলে লোকমা। এটা ঠিক মনে রাখতে পারব। দিজ ওয়ার্ড ইজ ভেরি ইজি। রকি গলা উঁচিয়ে 'ও হো হো ' করতে থাকে। দাদু ভাই চেচিয়ে বলেন, আমাদের খাওয়া শেষ, তোমার কদ্দূর পাবলো?

- আমার অনেক আইটেম দাদু, একটু সময় লাগবে। মনিকা মাছের ফ্রাই, সবজি, ডাল একসাথে মেখে নাতির মুখে দিয়ে বলেন, এত বড়ো ধাড়ি ছেলে মাছের কাঁটা বেছে খেতে পারে না। শেইম, শেইম। তাছাড়া মলা-কাঁচকি এসব ছোটো মাছ চোখের জন্য খুব ভালো- জানিস ?

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

- নাহ।

- জানো না তো কিছুই, এ জন্যই তো মা মণি আর পাপা ব্যাড বয় বলে।

ঠাম্মির হাতে মাখা ভাতের লোকমা খেয়ে, গল্প করে ভাব হয়ে গেছে দুজনের। খুশি মাখা গলায় বলে, তোমার হাতের লোকমা খেতে দারুণ লাগছে। মণিকা বলেন, এ তো শুধু মাছ-সবজি নয় পাবলো, এতে আমার ভালোবাসা-আদর-মায়া মেশানো রয়েছে যে।

- তাই ?

শনিবার রাতে ট্রলি ব্যাগে শাড়ি-কাপড় গুছিয়ে নিচ্ছেন ঠাম্মি। কাল সকালের ট্রেনে চলে যাবেন। কার্টুন দেখতে দেখতে হঠাৎ ছুটে আসে পাবলো, সঙ্গে রকিও। আচমকা শাড়ির আঁচল খামচে ধরে ঠাম্মির বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠে পাবলো। ওমা এ কী কাণ্ড! যে ছেলে বাড়িতে একা কাটায় সারাদিন, সে কি কখনও কাঁদে? পাবলো তো শক্তপোক্ত ছেলে। মা মণি ওর এলোমেলো চুলে আদুরে হাত বুলিয়ে বলে, তুই কাঁদছিস বাবা? পাবলো চেঁচিয়ে বলে, নাহ্ ওরা কক্ষনো যাবে না। আমি মাছ খাব, নিমপাতা-ওচ্ছে সব খাব ঠাম্মি। তুমি আমাকে লোকমা বানিয়ে খাইয়ে দেবে তো। প্লিজ যেও না তোমরা।

দাদুভাই গমগমে গলায় বলেন, কাঁদুক ও, বুকের ভেতরটা হালকা হবে। মায়া-মমতা-ভালোবাসা ওকে কাঁদাচ্ছে। এ যে সুখের কান্না। পাপা হাসতে হাসতে বলেন, এই পাবলো, করোনার কথা ভুলে গেছ? ফিজিক্যাল ডিসটেন্স মেনটেন করো।

সবাই হেসে ওঠে। শুধু রকি গলা উঁচিয়ে আওয়াজ করে যেন বলে, পাবলো তো গুড বয়। তোমরা কথা বলে আর আমাদের ডিস্টার্ব করো না বাপু। ■

লেখক: শিশু একাডেমি

স্মৃতির অ্যালবাম

মোহাম্মদ জিয়ন

দেখতে দেখতে অনেক বড়ো হয়ে গেছি
এখন আর নেই কোনো ভীতি
যত্নে রাখা পুরনো অ্যালবাম দেখে
মনে পড়ে যায় সেই দুরন্ত শৈশব স্মৃতি।

সেই দিনগুলো কেন আজ হলো বিভক্ত
যৌথ থেকে একক পরিবারে মনকে করল আসক্ত।
শৈশবের গোল্লাছুট আর মার্বেল খেলতাম সকলে মিলে
শাপলা ফুল তুলতে যেতাম কালিতলার বিলে।

আমাদের শৈশব আর এই সময়ের শৈশব পারি না মেলাতে
আগ্রহ নেই যেন এখনকার সন্তানদের কোনো খেলাতে,
মশগুল এখন সকলে প্রযুক্তির ব্যবহার করতে
হারিয়ে ফেলছে তারা সম্পর্কের বন্ধন বুঝতে।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

এমন যদি হতো

ইশরাত আরা দ্যুতি

এমন যদি হতো
ফুলের মালা গলায় নিয়ে
মুজিব ফিরে আসত।

এমন যদি হতো
কালো ফ্রেমের চশমা হাতে
মুজিব আবার ভাবত।

এমন যদি হতো
বাঙালিদের দুঃখে মুজিব
কষ্ট নিয়ে কাঁদত।

এমন যদি হতো
রেসকোর্সের ময়দানে
আবার ভাষণ দিত।

এমন যদি হতো
বনের পাখি ভোরের আকাশ
প্রাণ খুলে সব হাসত।

বঙ্গবন্ধু

এম এ নাসের

যুগ যুগ ধরে তাঁকে নিয়ে
লেখা হবে হাজারো গল্প-কবিতা
তিনিই সংগ্রাম করে এনেছিলেন
আমাদের স্বপ্নের স্বাধীনতা।

সততা, সাহস আর ভালোবাসা
ছিল তাঁর চলার পথের শক্তি
তাঁর নেতৃত্বের গুণেই হয়েছে
পাক-হায়েনাদের থেকে এ দেশের মুক্তি।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

[দ্বিতীয় পর্ব]

রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী

মুস্তাফা মাসুদ

রাজাকারের ক্যাম্পে

অবশেষে আমাদের নিয়ে আসা হলো থানা সদরের রাজাকার-ক্যাম্পে। সেখানে শহর থেকে আসা হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর দুজন অফিসার, ইসলামি ছাত্রসংঘের কয়েকজন এবং স্থানীয় শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীর কয়েকজন বড়ো লিডার মিটিং করছে।

আমাদের নিয়ে হাজির করা হলো মিটিং ঘরের মধ্যেই। আমাদের যারা ধরে এনেছিল, সেই রাজাকারদের একজন সবার উদ্দেশ্যে সামরিক কায়দায় স্যালুট দিয়ে ভাঙা ভাঙা উর্দু-মেশানো বাংলায় বলে– বহুত খোশ খবর হ্যায়। হাম তিন মুক্তিকো পাকাড় কার লিয়ে আতা হ্যায়। ইয়ে লোক সাংঘাতিক মুক্তি হ্যায়, ছারেরা!

রাজাকারটার কথা শুনে হানাদার বাহিনীর অফিসার একটু মুচকি হাসে– বোধ হয় রাজাকারটার কথা তার বিশ্বাস হয়নি। সে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

তারপর উচ্চহাসিতে চারদিক কাঁপিয়ে বলল– মুক্তি কাহা! ইয়ে তো নালায়েক বাচ্চালোগ হ্যায়। ছোড় দো উসকো! (অর্থাৎ মুক্তিফৌজ কোথায়! এরা তো নাবালক শিশু। ওদের ছেড়ে দাও।)

অফিসারের কথা শুনে রাজাকার কমান্ডার সানাউল্লাহ কাউমাউ করে ওঠে: নেহি নেহি ছার– উয়ো বাচ্চালোক নেহি– সাবালক! সাবালক! হাম জানতি পারিছি, আজকালকের মধ্যেই ওরা মুক্তিযুদ্ধ মে চলে যাবে। ওরা খতরনাক মুক্তি হয়ে যাবে ছার! ওদের গ্রামের পিরাই সব ছাওয়াল পাওয়ালই মুক্তিযুদ্ধ মে চলে গিয়া ছার। ভেরি ডেনজার, ছার! ভেরি ডেনজার!

রাজাকার কমান্ডারের সুরে সুর মেলায় শান্তি কমিটির সভাপতি প্রবীণ মুসলিম লীগ নেতা মুনশি কলিমুদ্দিন। চুল-দাড়িতে মেহেদির রং লাগানো। সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরনে। মাথায় পুরু ভেলভেটের কিশতি টুপি। ঘাড়ের ওপর একটা নকশাদার বড়ো রুমাল। মাথায় কোঁকড়ানো একটা বড়ো বেতের লাঠি তার চেয়ারের পাশে ঠেস দিয়ে রাখা। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে– আপ কাদেরকে বাচ্চা পোলাপান বলতা হ্যায়, ছার! আপলোক শোনেননি

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

যে, বড়ো সাপের চেয়ে বাচ্চা সাপকা বিষ বেশি তেজি আর জিয়াদা মারাত্মক হয় ছার? এরাও তেমনি হ্যায়, ছার। গ্রামের যিতনা পোলাপান মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেছে হ্যায়, তাদের প্রায় সবার বয়সই ওদের মতো, ছার। ওই সব পোলাপানেরাই তো ছার হামকো জবরদস্ত জওয়ানদের সাথে ফাইট দিচ্ছে হ্যায়। ওদের ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না, ছার! ওরা কালকেউটের বাচ্চা, বিচ্ছুকা বাচ্চা– ওরা ভেরি ডেনজার হ্যায়, ছার।

মুনশি কলিমুদ্দিনের কথায় অফিসার চুপ করে যায়। কী এক গভীর ভাবনা যেন তাকে কাবু করে ফেলেছে। সে হয়ত ভাবছে– যে দেশের স্বাধীনতার জন্য এমন কিশোর-তরুণ ছেলেরাও জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে যায়, তাদের হারানো যায় না। তাদের স্বাধীনতাও ঠেকিয়ে রাখা যায় না। বেশ কিছুক্ষণ পর অফিসার শুকনো মুখে বলে– ঠিক আছে, আপনারা যা ভালো মনে করেন, তাই করেন।

অফিসারের কথা শুনেই কমান্ডার সানাউল্লাহ, মুনশি কলিমুদ্দিন ও ছাত্রসংঘের নেতারা একসাথে বলে ওঠে: মারহাবা! মারহাবা! তখন আমার যে কেমন মনে হচ্ছিল, তা আর কী বলব, দাদুরা। মনে হচ্ছিল– আমার হাত যদি বাঁধা না থাকত আর হাতে একটা অস্ত্র পেতাম, তাহলে সব কটাকে খতম করে দিতাম– বিশেষ করে ওই বাঙালি বেঈমানদের আগে শেষ করতাম। কিন্তু দু-হাত শক্ত করে বাঁধা থাকায় কিছুই করতে পারলাম না। অন্য দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখি তারাও ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে। একটু ভালো করে খেয়াল করলেই তা বোঝা যায়। কিন্তু আর্মি অফিসার দুজনকে তোষামোদ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় কেউ তা লক্ষ করল না। শুধু কমান্ডার কড়া গলায় বলল– এই, তোরা এদের এখন হাজতে ভরে রাখ। মেজর সাব আর ক্যাপ্টেন সাব চলে গেলি ওদের ব্যবস্থা করবানে।

কমান্ডারের হুকুম পেয়েই রাইফেলধারী দুই রাজাকার আমাদের পিঠে রাইফেলের গুঁতো দিয়ে বলে– চল ব্যাটারা, হাজত মে চল। ওখানে বসে বসে আড্ডা ভাজা খাবি– বলেই আমাদের নিয়ে চলল ওরা।

কমান্ডারের অফিসের বেশ খানিকটা পশ্চিম দিকে একটা পুরনো দালান। সেখানে গিয়ে একটা রুমের তালা খোলে ওরা। আমাদের ইশারা করে ঘরে ঢুকতে। আমরা ঘরে ঢুকে দেখি সেখানে আরো চারটি ছেলেকে হাত বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়েছে। ওদের সবার বয়সই আমার চেয়ে কম মনে হলো। সবার চোখে ভয়। চোখ লাল। কান্নার চিহ্নও স্পষ্ট। কচি মুখগুলো শুকিয়ে একেবারে চিমসে হয়ে গেছে। তা দেখে আমি আমার নিজের বিপদের কথা ভুলে ওদের ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়ি। এ সময় প্রহরী রাজাকার দুটো আমাদের উদ্দেশ্যে কী যেন বলে খট করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। বাইরে থেকে তালা লাগানোর শব্দ শোনা গেল।

রাজাকার দুজন চলে যেতেই আমি বন্দি ছেলেদের দিকে তাকাই। আমি বয়সে ওদের চেয়ে একটু বড়ো বলে ওরা বোধহয় একটু ভরসা পেয়েছে। তাই ওরাও আমার দিকে তাকায়। ওরা ভাবছে আমি হয়ত বাঁচার একটা উপায় বের করতে পারব। আমার সাথের দুজন আর ওই ছেলেদের আমি বলি- দেখো ছোটো ভাইয়েরা, ভয় পাবা না। সাহস হারাবা না। বিপদে ভয় পেলে বা সাহস হারালেই সব মাটি। আর একটি কথা– দেশে এখন মুক্তিযুদ্ধ চলছে। মনে করো সেই যুদ্ধের আমরাও একেকজন সৈনিক। তা নয়তো কী? আমাদের তো মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহ করেই ওরা ধরেছে। তাছাড়া দু-দিন পরে তো আমরা মুক্তিযুদ্ধে যেতামই। তাই আমরাও এখন থেকে মুক্তিযোদ্ধা। এখানে ওদের হাতে যদি আমরা মারা যাই, যাব। কোনো ভয় বা দুঃখ করবা না কেউ। মনে করবা– আমরাও দেশের জন্য জীবন দিয়েছি, শহিদ হয়েছি।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ। সেই রাজাকার দুজনের একজন এসেছে আমাদের খাবার নিয়ে। একটা গামলায় ভাত, তাতে ডাল মেশানো আর জগে পানি। ছোটো একটা টিনের মগও আছে পানি খাওয়ার জন্য। ভাতের গামলা আর জগ-মগ নিচে নামিয়ে রেখেই ছেলেটি তাড়াতাড়ি দরজায় খিল এঁটে দেয়। তারপর বলে– খাও এবার, খা'য়ে ন্যাও। মনে অয় খুব খিদে পাইচে, না?

রাজাকার ছোকড়ার এখনকার ব্যবহারে আমরা ভীষণ অবাক হয়ে যাই। একটু আগে সে-ই তো আমাদের একটা খারাপ গালি দিয়েছিল। তবে কী ওটা ওর অভিনয় ছিল? ও কী আসলে রাজাকার, না ছদ্মবেশী কেউ? কিছুই বুঝতে পারি না। ধাঁধায় পড়ে খিদের কথাও যেন ভুলে গেছি। আমাদের ভাব দেখে ছেলেটি

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

তাড়াতাড়ি বলে– ও হ্যাঁ, তোমাদের হাত তো বাঁধা– খাবে কী করে, তাই না?– বলতে বলতে ছেলেটি আমাদের হাতের বাঁধন খুলে দেয়। তারপর বলে– পাশে বাথরুম। সেখানে বালতিতে পানি আছে। হাতেমুখে পানি দিয়ে এসো। ছেলেটির নরম কথায় আমরা সাহস পাই। ওর কথা শুনে ভাবতেই পারছি না ও একটা রাজাকার। যাই হোক, আমরা হাতমুখ ধুয়ে এসে খেতে বসি। একটাই গামলা, তাতে ডাল ভাত। পেটে খিদে চোঁ চোঁ করছে। সেই ডাল ভাতই আমার কাছে পোলাওয়ের মতো মনে হলো। এতক্ষণ পর বেশ একটু আরাম পেলাম। অন্যরাও খেলো। এক গামলা ভাতে সাতজনের পেট ভরার কথা না; তবুও মনে হয় পেট পুরেই খেয়েছি।

খাওয়ার পর ছেলেটি বলল– এখন কি একটু রেস্ট নিবা? নিয়ে ন্যাও। কাল পর্যন্ত বাঁচপা কিনা তার তো ঠিক নেই। রাতের অন্ধকারে গুলি করে ফিনিস করে দেবেনে কিনা তার কি ঠিক আছে?

ছেলেটি এমন সহজ আর স্বাচ্ছন্দ্যে কথাগুলো বলল, যেন গুলি করে মানুষ মারা রাজাকারদের কাছে ডাল ভাত। আমি ভাবলাম– যা হয় হবে। আমার তো দু-দিন বাদেই মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে গিয়ে যুদ্ধেও মারা যেতে পারতাম। তা না হয় কয়েক দিন আগেই তা ঘটল। ঘটুক। আমি মুক্তিযোদ্ধা– আমরা এই সাতজনই মুক্তিযোদ্ধা। রাতে গুলি করে মারে মারুক। কোনো ভাবেই ভয় পাওয়া চলবে না। সেলিম ভাই বা আমাদের গ্রামের অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো তথ্যই ওদের দেওয়া যাবে না– জান গেলেও না। আমি এসব ভাবছি, হঠাৎ ছেলেটা আমাদের অবাক করে দিয়ে বলে– না ভাইয়েরা, অত সহজে ফিনিস হওয়া চলবে না। বলেই, আমাদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই গামলা-জগ নিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাইরে দরজা বন্ধ করার শব্দ পাওয়া গেল।

আমার বুকের ওপর থেকে যেন ভারী একটা পাথর নেমে গেল, আমি নিজেকে খুব হালকা মনে করতে লাগলাম। অন্যদের দিকে চেয়ে দেখি তাদেরও বেশ চাঙা মনে হচ্ছে। তবুও ধাঁধায় পড়ে যাই– ছেলেটি কী বলে গেল? বারবার মনে হয়– ও কি সত্যি ওই কথা বলে গেল, না ভুল শুনলাম?

ঘরে এখন কেউ নেই। আমি আস্তে আস্তে অন্যদের বললাম– আমার নাম বাবু– মোহাম্মদ সোহানুর রহমান বাবু, বাঘারপাড়া হাই স্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র, আর আমার সাথি দুজনের নাম হামিদ ও রকিব। হামিদ ওই স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে আর রকিব স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে পরের বাড়িতে কামলা খাটে– খুব গরিব তো, তাই পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। আমাদের তিনজনেরই বাড়ি রতনপুর গ্রামে। এখন তোমাদের পরিচয় দাও।

ওরা একে একে ওদের নাম-পরিচয় বলে– ওদের নাম রশিদ, শান্ত, জুলফিকার আর বাবর। ওদের বাড়ি রায়পুর। ওরা সবাই রায়পুর হাই স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র। দু-দিন পরে ওদেরও মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার কথা। তার আগেই রাজাকারেরা ধরে এনেছে।

পরিচয়ের পর রাজাকারটার কথার প্রতি ইঙ্গিত করে আমি জিজ্ঞেস করি– ছোটো ভাইয়েরা, ওর কথায় কী বুঝলে? বাবর বলল– কিছুই বুজতি পাত্তিছি না, বাবু ভাই। বোধ হয় ইডা ওর চালাকি– আমাগের এট্টু ধান্ধায় ফেলে দেওয়া আর কী!

– আমারও তাই মনে হয়। ও আমাগের এট্টু লোভ দেহাল – হামিদ বলে। রশিদ, শান্ত, জুলফিকারের মতও তাই। কিন্তু রকিব বলল ভিন্ন কথা– আমার মনে হয় ও আসলে রাজাকার না– মুক্তিযোদ্ধাদের চর। কিন্তু মাথামোটা রাজাকাররা ওরে চিনতি পারেনি। আমি ভালো করে ওর মুখির দিক চা'য়ে দেহিছি। ওর কথা মিথ্যে হতি পারে না– ও সত্যি কথাই বলিছে। আমার বিশ্বাস, ও আমাগের বাঁচার এট্টা উপায় করবেনে।

– রকিব ঠিকই বলেছে। আমারও বিশ্বাস, ছেলেটা আসলে রাজাকার না– মুক্তিযোদ্ধাদের গুপ্তচর। কিন্তু এমন কঠিনভাবে অভিনয় করছে যে, কারো বোঝার উপায় নেই। তারপরও দেখা যাক কী হয়। সব আমাদের ধারণা বা বিশ্বাস। ও যে আসলে কে, তা তো আমরা কেউ এখনো জানি না। তবে ভাগ্য ভালো থাকলে আমরা ওর সাহায্য হয়ত পেতেও পারি।■

লেখক: শিশু সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

এখানে কে গাড়ি রং পার্কিং করেছে? ড্রাইভার কে? সরাতে বলো? সহকর্মী কনস্টেবলদের নির্দেশ দিলেন ওয়ারলেস হাতে পুলিশ কর্মকর্তা।

সিদ্ধেশ্বরীর এ গলিটায় যানজট লেগেই থাকে! সবজি ভ্যান ছাড়াও ব্যক্তিগত গাড়ি পার্ক করা থাকে সরু এ রাস্তায়। গাড়ি আটকিয়ে গেলেই সর্বনাশ! তার মধ্যে অসংখ্য রিকশা!

তবে আজকের যানজটটা ভিন্ন কারণে। শীতের সকালেই শিবমদের বাসার সামনে প্রচণ্ড ভিড়! পথচারীও চলাচল করতে পারছে না। রিকশা, ভ্যান, গাড়ি একটির সঙ্গে অন্যটি লেগে আছে। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ। সবাই বলছে কেন শিশুদের এই মানব বন্ধন? ফেস্টুন ও ব্যানার শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে! তাতে লেখা- গাছ নিধন বন্ধ কর বন্ধ কর। আলো চাই বাতাস চাই নইলে মোদের রক্ষা নাই। পরিবেশবান্ধব বাড়ি চাই, ঘর চাই।

৩৫ জন শিশু সবাই সারিবদ্ধভাবে রাস্তার প্রান্তে একটি নির্মাণাধীন বাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলেই একটি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। নেতৃত্বে শিবম। নূর, জারিফ, ওয়ারসি, অনন্ত, সাকিব, আইয়ান, দীপংকর, তামিম, আহিয়ান ও আরো অনেকে। পুলিশ শিবমদের জানালো রাস্তা ছেড়ে দিতে। নূর বলল, আমাদের দাবি একটাই, এ মহল্লায় আর গাছ কাটা যাবে না!

দীপংকর দেখতে বেশ লম্বা! হাতে লেখা একটি দরখাস্ত ওর হাতে। গাছ আমাদের বাতাসের মাধ্যমে অক্সিজেন দেয়। বৃক্ষ নিধন করে এলাকায় প্রচুর উঁচু ইমারত তৈরি হয়েছে। আকাশ দেখা যায় না। পাখিরা নেই। নেই সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় তেমন খেলার মাঠ। পরিবেশবান্ধব এলাকা প্রয়োজন। সুন্দর ও সবল স্বাস্থ্য গঠনে মুক্ত বাতাস জরুরি ইত্যাদি তথ্যসহ দীপংকর চিঠিটি এগিয়ে দিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাকে বলল:

-এই নিন স্যার আমাদের কথা!

ইউনিফর্মে আফসার নামের স্টিকারের পুলিশ কর্মকর্তা অবাক হয়ে গেলেন দরখাস্তের হস্তাক্ষর দেখে! বললেন

-এটা কি তোমার হাতের লেখা? বেশ সুন্দর তো!

দীপংকর নিশ্চুপ। ব্যানার শক্ত করে ধরে অনন্ত অত্যন্ত সজোরে বলে উঠে:

-না স্যার শিবমইমায় লেখছে! এ কথা শুনে বন্ধুরা হো হো করে হেসে ওঠে!

বাচ্চারা স্লোগান দিচ্ছে 'গাছ কাটা চলবে না চলবে না! আমাদের দাবি আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে!'

এলাকায় পুলিশ দেখে নির্মাণ শ্রমিকরা ভয় পেল!

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

পুলিশ নির্মাণাধীন ভবনের ঠিকাদারকে ডেকে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। আর দরখাস্ত পড়ে শিবম বাহিনীকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন- গাছ কাটা হবে না। এখানে বিল্ডিং হবে তবে গাছ নিধন না করে। এ কথা শুনে শিবম ও বন্ধুরা মানববন্ধন কর্মসূচির ইতি টেনে একে একে রাস্তা ছেড়ে সবাই চলে গেল।

বাসায় ঢুকেই শিবম মাকে জড়িয়ে ধরে।

-তুমি না বলেছ আমরা মুক্তিযুদ্ধে শত্রু মোকাবিলা করে দেশ স্বাধীন করেছি! আজ আমরা পরিবেশ রক্ষা করতে পেরেছি। শত্রু মোকাবিলা করে এলাকা স্বাধীন করেছি। জানো মা আজকে আমাদের বিজয় দিবস! আমাদের বিল্ডিংয়ের পাশের গাছটি আর কাটা হচ্ছে না। পুলিশ আংকেল আমাদের কথা দিয়েছে!

মা-ও বিষয়টি জানেন। মানববন্ধনের ধারণা ও পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ দিদির। দিদি মানে শিবমের বোন জয়ীর। ফেস্টুন ও ব্যানারের ভাষা এবং তা প্রস্তুত করে দেওয়া জয়ীর কাজ। মিতব্যয়ী অধ্যাপক বাবার কাছ থেকে টিফিনের কথা বলে টাকা নিয়েছে জয়ী। নূরদের বাসায় বিকেলে বসে বড়ো বোন মেঘনা, জয়ী, শিবম, সাকিব ও আহিয়ানরা কীভাবে গাছ কাটা বন্ধ করবে তা নিয়ে পরামর্শ করেছে। জয়ী ও মেঘনা বান্ধবী। ওরা বিজ্ঞানের ছাত্রী। নামকরা স্কুল থেকে দু'জন মেট্রিক পরীক্ষা দেবে এবার।

শিবমদের বাসার বিল্ডিংটা ছ'তলা। ওদের বাসার ওপরে ছাদ। সেখানে সে মাকে নিয়ে আখসহ নানা ফুলের গাছ লাগিয়েছে। পরিবেশ পরিচিতি বইয়ে শিবম জেনেছে গাছ জীবন বাঁচায়। পরিবেশ ও সকল প্রাণীদের রক্ষা করে বৃক্ষ। ড্রয়িংরুমটা ওদের বেশ বড়ো। বাবা যতক্ষণ বাসায় থাকে প্রায় সময়টাই বাবার হাতে থাকে মোটা মোটা বই! শিবম বাবাকেও নানা প্রশ্ন করে। বই পাঠে নিমগ্ন থাকেন বাবা! ওর প্রশ্নের উত্তর কখনো দেন, কখনো দেন না।

স্কুল শেষ করে শিবম ঝকঝকে সকালের আলোয় জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। পাশেই একটি বড়ো আমগাছ। আগে তিনটি গাছ ছিল। সে গাছের ডালে পাখিদের আড্ডা! তা দেখে শিবমের ভালো লাগে। মা-ও ওর সঙ্গে এসে মাঝে মাঝে জানালার পাশে এসে দাঁড়ান। স্বচ্ছ আলো আর নির্মল বাতাস ওদের মন ভরিয়ে দেয়। ওদের বিল্ডিং লাগোয়া দোতলা ছাদ। ছাদে কবুতরদের বাসা। ওদের নানা খাবার দেয় শিবম।

লিফট ছাড়া শিবমদের বাসা। সবারই উঠা নামা করতে বেশ কষ্ট হয়। ভাড়াও অনেক বেশি। পুরনো দালান! পোকামাকড়ের বসতি। মাঝে মাঝে রান্নাঘরের ভাঙা জানালা দিয়ে ইঁদুরও ঢোকে। গভীর রাতে ঘুম ব্যাঘাত-ছাদ ঢালাই মেশিনের উৎকট শব্দ! বাসার কোনো কিছু বিকল বা নষ্ট হলে বাড়িওয়ালা ঠিক করে দেন না। মা, দিদি ও শিবমের প্রচণ্ড টিকটিকি ভীতি! বাবাকেও বেশ দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে! দিদির পরীক্ষা শেষে সমস্যায় জর্জরিত বাসাটি বাবা পালটাবেন এমন সিদ্ধান্ত পাকা। তাছাড়া বাসার পাশে গাছ কেটে বিল্ডিং উঠবে। আলোর বদলে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে বাসাটা!

কাজ শেষে রাতে বাসায় ফিরলেন বাবা। নিচে প্রতিবেশীদের কাছে শিবম ও তার বন্ধুদের আজকের মানববন্ধনের ঘটনাটি জেনেছেন। শিবম দুপুরে বাবাকে ল্যান্ডফোনে জানিয়েছিল! ছেলেমেয়ের বীরোচিত খবরে বাবার মহানন্দ! ফেরার পথে বাবা নিয়ে এসেছেন শিবমের প্রিয় চিকেন বার্গার, জয়ীর ভাপা পিঠা আর মায়ের জন্য বার্টার লোফ!

মা বললেন:

- ও তুমি জেনে গেছ তাহলে?

বাবা মাথা নাড়ান। বলেন

- আমি তোমাদের একটি সুখবর দেই। জয়ী বলল

- আমি জানি বাবা তুমি কী বলবে? নিশ্চয়ই নতুন বাসার অ্যাডভান্স করে এসেছ!

- না! তা নয়! শুনেছি পাশের বাসাটা আর আটতলা হচ্ছে না। চার তলার অনুমোদন পেয়েছে ওরা। গাছও নিধন হচ্ছে না। এত ছেলেমেয়ের বিজয়! তাই আলো-বাতাস ভরপুর এ বাসাতেই থাকছি আমরা। বাবার কথায় শিবম বেজায় খুশি! কিন্তু বাবার চোখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন মা! ■

লেখক: গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

গাছ লাগাব দেশ বাঁচাব

ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান

লোকে বলে বোবার নাকি শত্রু কেহ নাই
এই কথাটি মিথ্যে কথা, প্রমাণ দিতে চাই।
যেমন ধরো গাছের কথা, দাঁড়িয়ে থাকে চুপ
ফুলে ফলে সবুজ ছায়া, গাছের নানান রূপ।

ফলজ গাছ, বনজ গাছ, ঔষধি গাছ যত
সকল প্রকার গাছগাছালি মানব সেবায় ব্রত।
গাছ দিয়েছে ফুলের সুবাস, গাছ দিয়েছে ফল
ফল খেতে খুব সুস্বাদু তার, দেহে বাড়ায় বল।

গাছ থেকে পাই সুস্থ থাকার ওষুধ মূল্যবান
মানবজীবন গাছের দেওয়া অক্সিজেনের দান।
গাছ রয়েছে ঠায় দাঁড়িয়ে দেয় বিলিয়ে ছায়া
ক্লান্ত পথিক গাছের নিচে নেয় জুড়িয়ে কায়া।

গাছের ডালে পাখির বাসা আনন্দে গায় গান
কেউ বুঝি না এই গাছেরও দেহে আছে প্রাণ।
গাছগাছালি রক্ষা করে জাগতিক ভারসাম্য
গাছের এমন শত্রু হওয়া মানুষের নয় কাম্য।

বন্যা বাদল ঘুর্ণিঝড়ে বাঁচায় বাড়িঘর
গাছ কখনো মানুষের ন্যায় হয় না স্বার্থপর।
প্রয়োজনে গাছ কাটিলে রোপণ করো চারা
গাছ লাগাব, দেশ বাঁচাব, শপথে দাও সাড়া।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

মো. রাফিউল ইসলাম, সপ্তম শ্রেণি, শের-ই-বাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

আর নয় পরিবেশ দূষণ

হারুন-উজ-জামান

আমাদের চারপাশের জীব ও জড় উপাদানের প্রভাবের ফলে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বিষয়-আশয় বা অবস্থাকে আমরা পরিবেশ বলে থাকি। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, পরিবেশ বলতে স্থান ও কালের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে মানুষকে ঘিরে থাকা সকল অবস্থার যোগফলকে বোঝায়। স্থান ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবেশও পরিবর্তিত হয়। এই পরিবেশ আমাদের বন্ধু। আমাদের শরীরের কোনো অঙ্গহানি হলে যেমন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি কিংবা এ হানির ফলে আমরা যেমন মারাও যেতে পারি, ঠিক তেমনি আমাদের প্রিয় পরিবেশ বিনষ্ট কিংবা দূষিত হলে আমরা ক্রমে ক্রমে মারাও যেতে পারি। আমাদের বাঁচার জন্য বিশেষ করে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য সুস্থ পরিবেশ খুবই প্রয়োজন।

প্রতিনিয়তই দূষিত কিংবা বিনষ্ট হচ্ছে আমাদের পরিবেশ। এ পরিবেশ দূষণ, বিনষ্ট কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করছি কখনো না জেনে, কখনো আবার জেনে। পরিবেশের ভারসাম্য সংকটে সৃষ্টি হচ্ছে বায়ুদূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, মাটি দূষণসহ আরো নানারকমের দূষণ। আর এসব দূষণগুলো হচ্ছে মূলত: চুল্লি, যানবাহনের কালো ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া, বর্জ্য, কীটনাশক, নদীতে ফেলা বর্জ্য, কীটনাশকের ব্যবহার, হাইড্রোলিক হর্নের শব্দ, সাইরেন, মাইকের উচ্চ শব্দ ইত্যাদি থেকে। তাছাড়া নির্বিচারে গাছ কাটা, পাহাড় কাটার ফলেও পরিবেশ পড়ছে হুমকির চরম মুখে।

পরিবেশের ক্ষেত্রে মানুষের বসবাসের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর সংকট হচ্ছে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া। কী সেই গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া? বায়ুতে উপস্থিত কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও অন্যান্য গ্যাসের আধিক্যের কারণে বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তরে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়াকে গ্রীন হাউজ এফেক্ট বা গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া বলে। কেন হয় এই এফেক্ট বা প্রতিক্রিয়া? সহজভাবে বলা যায়, গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। কিন্তু নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন কমে যায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করার মতো কিছু না থাকায় বেড়ে যায় কার্বন ডাই-অক্সাইড।

তাছাড়া বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে নানা প্রকারের ধোঁয়া, পঁচনশীল দ্রব্য থেকে আসা নানারকম গ্যাস। কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য এই সব গ্যাসকে বলা হয় গ্রীন হাউজ গ্যাস। এই গ্রীন হাউজ গ্যাস বায়ুমণ্ডলে বৃদ্ধি পাওয়ায় সূর্য থেকে আসা উচ্চ শক্তির আলোকরশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে কয়েকটি প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠে যখন পৌঁছায়, প্রতিফলিত হয়ে এর বৃহৎ অংশ সৌরজগতে ফেরত যেতে পারে না। খুব সামান্যই মহাশূন্যে ফেরত যায়। অবশিষ্ট সব আলোকরশ্মির তাপ উক্ত গ্রীন হাউজ গ্যাস দ্বারা শোষিত হয়, ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আর স্বাভাবিক সময়ে প্রতিফলিত হয়ে অতিরিক্ত তাপের বৃহৎ অংশই সৌরজগতে ফেরত যায়। কিন্তু দিনে দিনে বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউজ গ্যাস বিশেষ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন গ্যাস ইত্যাদি বেড়ে যাওয়ার ফলে সৌরজগতে বিকিরিত হয়ে তাপ ফেরত যেতে না পারার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পরিবর্তিত হচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ু।

দিনে দিনে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমে ক্রমে বেড়ে যাবে। ক্রমান্বয়ে অনেক শহর, দ্বীপ, দেশ কিংবা নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যাবে পানিতে। তাছাড়া খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়, ঘূর্ণি ঝড় ইত্যাদি ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে পৃথিবী থেকে ৭৬ রকমের প্রাণী ও কয়েক হাজার রকমের গাছপালাই ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ১৩২ রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণী ও ২৬ রকম প্রজাতির পাখির বংশ বিলুপ্তির পথে। বহু সমতল ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার আভাস দিচ্ছে।

পৃথিবীর সব দেশের সীমানা রয়েছে। কিন্তু পরিবেশের কোনো নির্দিষ্ট সীমানা নেই। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে এক দেশের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে অন্য দেশেও এর প্রভাব পড়বে। তাই পরিবেশের এ সংকট থেকে পরিত্রাণের দায় শুধু কোনো দেশের একার নয়। এ দায় সকল দেশের সমগ্র মানবজাতির। পৃথিবীর সব দেশকে একসাথে পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। অবশ্য বিভিন্ন দেশে ইতোমধ্যে অনেক পরিবেশবাদী সংগঠন গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশেও রয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। রয়েছে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫। বিভিন্ন দেশকে স্ব স্ব দেশের পরিবেশ বিপর্যয় ঠেকাতে পরিবেশ দূষণের প্রকৃত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। পরিবেশের বিপর্যয় ঠেকাতে কিংবা পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখা প্রয়োজন। টেকসই পরিবেশের জন্য বিভিন্নভাবে গণসচেতনতা বাড়াতে হবে। আমাদের বাড়িঘর, কলকারখানা ও বিভিন্ন স্থাপনা পরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করতে হবে।

- ❑ সকল কলকারখানার বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ❑ প্লাস্টিক কিংবা পলিথিন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- ❑ মৃত জীবজন্তু বা জৈব আবর্জনা মাটি চাপা দিয়ে রাখতে হবে।
- ❑ গাছ কাটা বন্ধ এবং বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।
- ❑ পাহাড় কাটা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।
- ❑ গাড়ি, ইটভাটা এবং কলকারখানার কালো ধোঁয়ার পরিবর্তে বিকল্প ব্যবস্থা বের করতে হবে।
- ❑ বন ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় টেকসই উদ্যোগ নিতে হবে।
- ❑ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ❑ জমির ফসলে, শাকসবজি, ফুল ও ফলে কিংবা বৃক্ষে কীটনাশকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।
- ❑ উপকূলীয় এলাকায় শক্ত ও টেকসই বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। ■

লেখক: যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

আম-কাঁঠালের দিনে

সনজিত দে

মনটা কেমন ফুরফুরে আজ একটি খবর পেয়ে
খুশির জোয়ারে মনটা নাচেরে গুনগুন গান গেয়ে ।
এই সুখবর বাবা দিয়েছেন আমাকে সামনে ডেকে
গ্রীষ্মে এবার গ্রামের বাড়িতে চলে যাব প্রত্যেকে ।

বাবার ছুটিটা হতে শুধু দেরি ছুটি হলে যাব চলে
কত কী করব জল্পনা সব নেচে ওঠে কৌতূহলে ।
মা মণিকে বলতে শুনেছি পুকুরে জেলেরা টানবে জাল
আহারে আমি যে এমন দৃশ্য দেখি নাই কতকাল ।

কাকার মেয়েটি দেখেছি যখনি বয়স ছয় কি সাত
এখনও নাকি সারা বাড়িটাকে করে রাখে বাজিমাত ।
জমে যাবে বাড়ি ক'টা দিন পরে আম-কাঁঠালের দিনে
বৈশাখি মেলা গুরু বলী খেলা এটা ওটা নেব কিনে ।

অবশেষে এল বাড়িতে যাবার সেই সে সময় ক্ষণ
গাড়িতে উঠেছি গাড়ি ছুটে যায় নেচে নেচে ওঠে মন ।
শহরের মতো পিচঢালা পথে এগিয়ে ছুটেছে গাড়ি
বুঝতে পারিনি গাড়ি থেমে যায় আমরা এসেছি বাড়ি ।

তড়িঘড়ি নেমে আহা কী যে সুখ মাটি বলে স্বাগতম
বাতাসেরা দোলে পাখিরা গাইছে পরিবেশ মনোরম ।
কাকার মেয়েটি মহাখুশি আজ আমাদের দেখে হাসে
এটা ওটা এনে খেতে দেয় শুধু মনভরা উচ্ছ্বাসে ।

দেখালো কত কী সবুজাভ বন কুড়িয়ে নিয়েছি আম
লতাপাতা ঝোঁপে আহা মনোহর প্রথম পা বাড়ালাম ।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ছড়ার হাটে

শাকিব হুসাইন

প্রজাপতি পাঠালো চিঠি
কুমড়ো ফুলের খামে,
নেমন্তন্নের সেই চিঠিটা
আসলো আমার নামে।

ছড়ার হাটে জমবে আজ
ফুল-পাখিদের মেলা,
হরেক রকম আসবে পাখি
করবে মজার খেলা।

একটু পরেই প্রজাপতি
পাঠিয়ে দিল নাও,
ফড়িং ছানা এসে বলে -
জলদি করে যাও।

নায়ের মাঝি নামিয়ে দিল
ছড়া নদীর ঘাটে,
ফুল পাখি আর প্রজাপতি
আছে ছড়ার হাটে।

একাদশ শ্রেণি, দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর

বর্ষা

মো. আবুবকর

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে
নামবে আবার ঢল
কদিন ধরেই চলছে এমন
সাথে ব্যাঙের কোলাহল।

বৃষ্টি ভেজা কদম ফুল
কেতকী আর কেয়া
ভিজতে তাদের ভালো লাগে
তারা ফুল বাগানের হিয়া।

ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি ভাই
আমার অনেক প্রিয়
ঝুম বৃষ্টি এলে এবার
চায়ের দাওয়াত দিও।

দ্বাদশ শ্রেণি, বাগাতিপাড়া সরকারি কলেজ, নাটোর

বৃষ্টি পড়ে

সুমাইয়া আক্তার

টুপটাপ বৃষ্টি যখন
অঝোর ধারায় ঝরে
মন আনন্দে ভিজে যাই
ইচ্ছেমতো করে।
দলবেধে মেতে উঠি
বাড়ির উঠোনে
মা এসে দেন বকা
দাঁড়িয়ে ঘরের কোণে।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, বারহাট্টা গার্লস স্কুল, নেত্রকোণা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

রানি হবো

রুস্তম আলী

নীল আকাশে উঠব আমি
মনের সিঁড়ি বেয়ে।
রং কুড়াতে যাব আমি
রংধনুর দেশে।
মেঘ আমাকে ডাকছে বলে
চাঁদের হিংসা লাগে।
মা, ডাকছে ওঠো খুকি
পাখি তখন ডাকে।
আমার রানি হবার সাধ তখনই
ধুলায় গেল মিশে।

গ্রামের সন্ধ্যা

মো. কামাল শেখ

কিচিরমিচির পাখির ডাক
সাপের মতোন নদীর বাঁক
সেই বাঁকে সব কাশফুলেরা দোলে,
সোনার বরণ মাঠের ধান
ঐকতানে চাষির গান
যেই গানে তে বিশ্বভুবন ভোলে।

আকাশ জুড়ে রূপের চাঁদ
খুকুর হাসি ভাঙল বাঁধ
বৃষ্টি ছড়া মধুর কলতানে,
ঘুড়ির সুতোয় পড়ল টান
মৌমাছিরা জুড়ল গান
সন্ধ্যা নামে হাসনাহেনার ঘ্রাণে।

চুপ চুপ

রোকসানা গুলশান

কড়কড় ডাকে মেঘ, নাচে ব্যাঙ থপ থপ
থেকে থেকে শুনি গান, ঝুপ ঝুপ ঝাপ ঝাপ।

বর্ষার বৃষ্টিতে, ভিজে সব চপচপ
দিনভর শুনি গান, টিপ টিপ টপ টপ।

শনশন বাতাসেতে, ঝরে ফুল ঝরঝর
সারি করে পুকুরেতে, যাবে হাঁস সরসর।

চুপ চুপ কোন পাখি, সুর তোলে কুক কুক
ঘুম থেকে উঠে শিশু, খায় দুধ চুকচুক।

টিকটিক করে ঘড়ি, রাতদিন ঠিক ঠিক
মিটমিট করে চেয়ে, হাসে তাই ফিক ফিক।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

গল্প

হিরো রোগ ও মাছের জরুরি সভা

মোস্তাফিজুল হক

কাটাখালির টলটলে কালো জলে ছোটো মাছেরা জরুরি সভা ডেকেছে। কারণ, তিনদিন হলো কৈ আর মাগুর পোনাদের নাকি হঠাৎ করে খুব মাথাব্যথা! কিছুতেই ওদের এ রোগ ভালো হচ্ছে না। আগে মাছের পোনাদের কখনও কারোর এ রকম রোগ ছিল না। তাই সবার মনে ভীষণ ভয় ঢুকে গেছে। মাগুর আর কৈ মাছেরা কেঁদে-কেটে অস্থির।

মাগুর, শিং, কৈ, পাবদা, টাকি, চেলা, টেংরা, পুঁটি, খলসে ও দেঁতো পুঁটিদের সবাই সভায় এসেছে। এ নিয়ে এর আগেও বেশ কয়েকবার আলোচনা হয়েছে।

টাকির সভাপতিত্বে সভা চলছে। বক্তার তালিকা দেখে টেংরা বলল, 'পাবদা ভাবি কিছু বলুন।'

পাবদা বলল, 'আমি শুনেছি এ রকম রোগ নাকি কিছু কিছু মানব শিশুর হয়। ওরা নাকি সারাদিন মোবাইলে গেইম খেলে নয়তো টিভিতে কার্টুন দেখে। অথচ ছোটোদের এসব যন্ত্র পড়াশোনা আর স্বল্প পরিমাণে আনন্দের জন্য ব্যবহার করতে হয়। কারণ বেশি ব্যবহারে চোখে ও মগজে ভীষণ রকম চাপ পড়ে। ফলে মেজাজ খিটখিটে হয়। এছাড়া ক্ষুধামন্দাও তৈরি হয়। এতে করে মানব শিশুরা নানান কারণেই অক্ষমতা নিয়ে বাড়ছে। ওরা যে গল্পের বইটা হাতে নিয়ে পড়ার কথা, ওটা কার্টুন হিসেবে দেখছে। এতে করে ওদের বানান ও ভাষা বিষয়ে কিছুই জানা হচ্ছে না। শুনেছি, শেষ পর্যন্ত ওদের কাছে পাঠ্যবইটাও অসহ্য লাগে। ওরা হয়ে ওঠে বোকা আর অবাধ্য স্বভাবের। বোকা হয়ে যাওয়া এসব শিশুরা অনেক সময় অপহরণের শিকারও হয়। তবে মাছের পোনারা তো আর প্রযুক্তি যুগের মানব শিশু না? তাহলে হঠাৎ করে মাগুর আর কৈ-এর পোনাদের কেন এ রকম রোগে ধরল?'

পাবদার আগে পরে অনেকেই আলোচনা করল। তবে আলোচনায় কেউ কোনো উপায় খুঁজে পেল না। অথচ মিটিং শেষের পথে। শেষমেষ ছোট্ট চেলা সাহস করে বলল, 'আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই?'

কাঁটাঅলা শিং মাছ রাগে গড়গড় করে বলল, তুই আবার কী বলবি?

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

টাকি বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, বলুক না!'

চেলা বলল, 'আমাদের খালপাড়ে যে ডিঙিটা আছে, ওরা প্রায়ই ওটাকে শির দিয়ে ঠেলাঠেলি করে।'

চেলার কথা বলা শেষ হলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে পুঁটি মাছ বলল, 'হ্যাঁ, চেলা ভালো কথা মনে করে দিয়েছে। আমার তো বেশ মনে পড়ছে- ওরা দেখি প্রায়ই ঘাটে এসে খেয়াটাকে ঠেলে এপার থেকে ওপারে নেবার চেষ্টা করে! বিশেষ করে মাগুর মাসির পোনাদেরকে বহুবার এ রকম করে ঠেলতে দেখেছি। তখন যদি ঘাটে কোনো জেলে থাকত? কী দশা হতো! একটা একটা করে সব ধরে নিয়ে যেত!'

'আচ্ছা টাকি কাকা, ওরা নৌকাটা যে এভাবে এপার থেকে ওপারে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, তা কি ঠিক করেছে?' চেলা আবার প্রশ্ন করল।

দেঁতো পুঁটি বলল, 'সর্বনাশের কথা! এতে করে ওদের তো অনেক চাপ পড়ে! বিশেষ করে ঘাড়ে আর মাথায়। এটা ওদেরকে কে বোঝাবে? ওদের এই জোর এখন কই গেল? বেহুদা এ হিম্মত দেখানোই ওদের কাল হয়েছে।'

চেলা এবার হেসে দিয়ে বলল, 'ওরা হিরো সাজতে চায়। আসলে ওদের হিরো রোগে ধরেছে! মাগুর খালা আর কৈ ফুপুর পোনারা ভীষণ দুষ্টু। ওরা হিম্মত ভুলে গিয়েছিল। তাই দৈত্যের মতো খেলায় মেতেছিল!'

সব শুনে কৈ বলল, 'তাই যদি হয়, তবে তো রোজই মাথা ধরবে! ওরা তো ছোটো। আর ছোটো হয়ে এ রকম অসম্ভব কাজ কেউ করে নাকি? এতটা শারীরিক পরিশ্রম করলে বিপদের মুখে পড়বেই। এতে করে ওরা রোগে ভুগে মরবেই।'

খলসে বলল, 'মাননীয় সভাপতি, আমাদের বিজ্ঞ টাকি জেঠা- আমি বলি কী একটা আইন করা দরকার। এখন থেকে পোনাদেরকে কলমিদাম বা পদ্মপাতার নিচে থাকতে হবে। মাথায় ও ঘাড়ে চাপ পড়ে এ রকম খেলাও নিষিদ্ধ করতে হবে। চলাফেরা করতে হবে দলবেধে। তাহলেই দলছুট হতে পারবে না ওরা। মানুষদেরও মনে হয় মোবাইলে গেইম খেলার সুবিধা বাতিল করা উচিত। সবগুলো টিভি চ্যানেল একটা নির্দিষ্ট সময়ে একসাথে কার্টুন প্রচার করতে পারে। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া এসব কার্টুন প্রচার বন্ধ করা উচিত। এ রকম একটা আইন তারাও করতে পারে। এতে করে স্বাস্থ্য ও মেধার ক্ষতি হয়, এমন কাজে বাচ্চারা আর জড়াতে পারবে না।

সবাই করতালি দিয়ে সুবক্তা খলসের সিদ্ধান্ত মেনে নিল। শেষে সভাপতি বলল, 'মানুষের বিষয়টা আমাদের মতো ছোটো প্রাণীদের ভাবার সুযোগ নেই। আর হ্যাঁ, একটা খুশির খবর হলো, ওষুধটা গতকালই জোগাড় করেছি। তবে সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম।'

এরপর সভাপতি টাকি একটা থলে থেকে কী যেন জলজ ফুলের মধু বের করল। কৈ ও মাগুরের পোনাদেরকে তা পান করালো। ধীরে ধীরে ওদের মাথাব্যথাও কমে গেল। সেদিন থেকেই মাছ মায়েরা পোনাদের খোঁজ একটু বেশিই রাখে। ওরাও মায়ের সাথে কলমিদাম আর পদ্মপাতার নিচেই থাকে।■

লেখক: গল্পকার

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

গল্প

ধুড়ুম

খায়রুল বাবুই

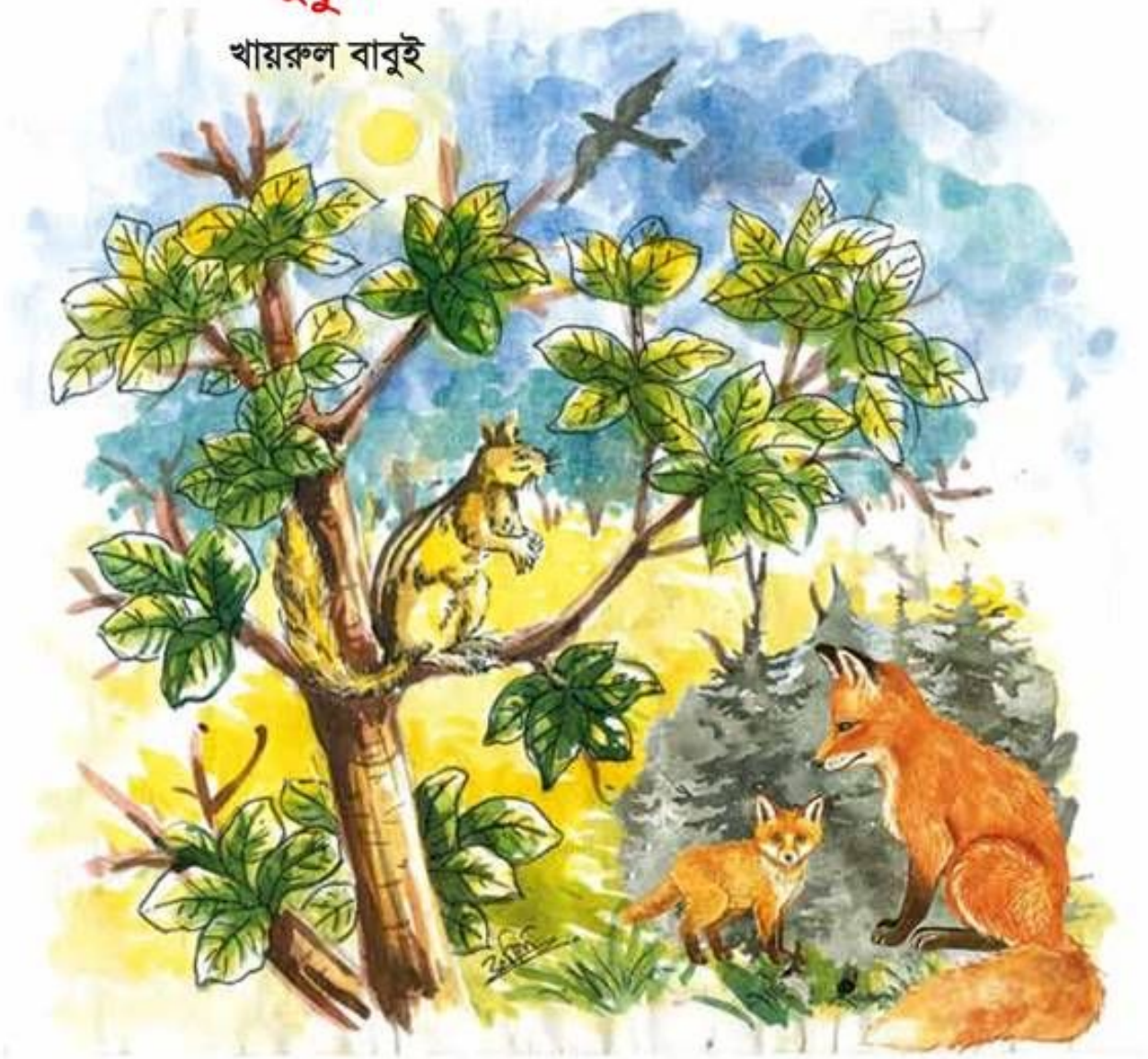

'আঁউ...।'

ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে কাঠবিড়ালিটি। সাবধানেই নড়াচড়া করছিল। তবুও বাঁচতে পারল না। কাঁটার খোঁচাটা হজম করতেই হলো।

মধ্য দুপুর। চারদিক সুনসান। লম্বা খেজুর গাছটার মাথায় বসে আছে কাঠবিড়ালি। চারপাশে ছোটো-বড়ো বিভিন্ন রকমের গাছ। সে-সবের ফাঁক দিয়ে চারপাশে উঁকি দেয়।

নাহ, অন্য কেউ নেই।

হাতের নাগালে থোকায় থোকায় পাকা খেজুর। একটা ছিঁড়ে মুখে দিতেই ব্যথার কথা ভুলে গেল। কি সুমিষ্ট! আহা! ক্ষুধাটাও লেগেছিল খুব। ধারালো দাঁত দিয়ে টপাটপ কয়েকটা খেজুর সাবাড় করে দেয়। পেট ভরে গেছে প্রায়। ঘুম-ঘুম ভাব আসছে...।

'ম্যাও-ও-ও-ও...'।

ঝিমুনি কেটে যায় কাঠবিড়ালির। রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে নিচে তাকায়।

'তুমি আবার এসেছ? কী চাও এখানে?'

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

'খেজুর গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কি কাঁঠাল চাইব?' বিড়ালটা মুচকি হাসে, 'পাকা দেখে কয়েকটা খেজুর ছিঁড়ে নিচে ফেলো তো। খুব ক্ষুধা লেগেছে।'

'অ্যাঁহ..., কী আবদার!' কাঠবিড়ালি ভেংচি কেটে বলে, 'আমি কত কষ্ট করে খেজুর গাছে উঠলাম। কাঁটার খোঁচা খেলাম। আর তুমি এমনি-এমনি খেজুর খেতে চাও?'

'আরে বোকা, আমি কি তোমার মতো অত সহজে গাছে উঠতে পারি?' বিড়ালের কণ্ঠে অনুনয়, 'খেয়াল করেছ, তোমার সঙ্গে আমার নামের কি মিল। আমি বিড়াল, তুমি বিড়ালি...'

'উঁহু... আমি বিড়ালি না, কাঠবিড়ালি।'

'ওই তো, হলো। দাও না কয়েকটা পাকা খেজুর...' বিড়াল নাছোড়বান্দা।

একটি খেজুরে টুকুস করে কামড় দেয় কাঠবিড়ালি। তারপর চিবুতে চিবুতে বলে, 'কিছু পেতে হলে কষ্ট করতে হয়।'

ঠিক তখনই 'আ-উ-উ-উ-উ...' বলে চিৎকার করে ওঠে বিড়ালটি। লাফিয়ে পিছন ফেরে। দেখে, তার লেজের ওপর সজারু দাঁড়িয়ে আছে।

'দুঃখিত বিড়াল ভাই, খেয়াল করিনি...।' বিড়ালের লেজের ওপর থেকে সরে আসে সজারু।

'গা-ভর্তি কাঁটা নিয়ে একটু সাবধানে চলাফেরা করতে পারো না?' লেজ নাড়াতে নাড়াতে ব্যথার্ত কণ্ঠে বলে বিড়াল।

'আরে, পেটে ক্ষুধা থাকলে কি এত কিছু খেয়াল থাকে?' বলতে বলতে খেজুর গাছে বসা কাঠবিড়ালির দিকে তাকায় সজারু, 'হাই ছোট্ট বন্ধু, ক্যামন আছো?'

'খেজুর খেতে চাচ্ছো, সেটা সরাসরি বললেই হয়।' কাঠবিড়ালির কণ্ঠে টিটকারির সুর।

'আরেহ, কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা।' সজারু হাসিমুখে বলে, 'একটু খোঁজখবর তো নিতে হবে, নাকি?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, এই নাও...' বলে কাঠবিড়ালিটি একটা খেজুর ফেলল নিচে। পড়ল গিয়ে বিড়ালের সামনে। বিড়াল সেটি তুলে নিয়ে টুপ করে মুখে পুরল।

'এ কেমন কথা? এই খেজুরটি তো আমার।' সজারু রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল।

আয়েশ করে খেজুরটি চিবুতে লাগল বিড়াল, 'গাছের নিচে আমি আগে এসেছি, তাই আমি আগে খাব– এটাই তো নিয়ম, তাই না?'

আকাশে মেঘ করেছে। হঠাৎ হঠাৎ হালকা বাতাসে দুলে উঠছে খেজুর গাছের ডালগুলো। সতর্কভাবে বসল কাঠবিড়ালি। তারপর নিচে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে বলল, 'এতই যখন নিয়ম জানো, তাহলে নিজে গাছে উঠতে পারো না?'

'সেটা তো পারি। কিন্তু ইয়ে...' বিড়াল আমতা আমতা করতে থাকে, 'খেজুরগুলো এত উঁচুতে আর গাছে এত কাঁটা– আমার পক্ষে সম্ভব না। অ্যাই সজারু, তুমি ওঠো না...।'

'গা-ভর্তি কাঁটা নিয়ে আমি খেজুর গাছে উঠব? মশকরা করছ?' সজারু ধমক দেয়।

'ঘেউ ঘেউ ঘেউ...। কী হচ্ছে এখানে? এত চেঁচামেচি কীসের?'

'ওই তো, কুকুর চলে এসেছে।' থোকা থেকে আরেকটা খেজুর ছিঁড়ে মুখে দেয় কাঠবিড়ালি। তারপর বিড়াল আর সজারুকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'তোমরা দুজন গাছে উঠতে না পারলে কুকুরকে উঠিয়ে দাও।'

'হাস্যকর কথা বোলো না। আমি গাছে চড়তে পারি না...।' কুকুর আপত্তি জানায়।

বিড়াল মুচকি হেসে বলে, 'সারাক্ষণ শুধু ঘেউ ঘেউ করলে হবে? একবার চেষ্টা করে দেখো।'

'না না, অসম্ভব। কখনো দেখেছ কোনো কুকুরকে খেজুর গাছে উঠতে? তাছাড়া আমি তো খেজুর খাইও না।'

'ভালো জিনিস পেলে তো খাবে...।' বলতে বলতে শিয়াল এসে দাঁড়ায় গাছের নিচে।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

কুকুর ধমকে ওঠে, 'তুমি পণ্ডিতি করতে এসো না।'

'আরে, উত্তেজিত হচ্ছো কেন?' শিয়াল বোঝানোর চেষ্টা করে, 'খেজুর খাওয়া ভালো। কারণ খেজুরের মধ্যে আছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট...'

'কী-ই-ই-ই...?' বিড়াল, সজারু আর কুকুর একসঙ্গে বলে ওঠে।

'অ্যাক্সিডেন্ট...!' কাঠবিড়ালি চমকে ওঠে। একটু হলেই হাত ফসকে নিচে পড়ে যেত।

'হা হা হা...' শিয়াল হাসতে হাসতে বলে, 'এজন্যই বলি, শুধু খাওয়া আর ঘুরে বেড়ানো বাদ দিয়ে একটু জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করো সবাই। ওটা অ্যাক্সিডেন্ট না, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট...'

'ম্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা...। আমি ঘাস, লতাপাতা, খেজুর, অক্সিডেন্ট– সব খাই। যা পাই, তা-ই খাই...।'

'এজন্যই তো তুমি ছাগল। হি হি হি...' সজারু হাসতে হাসতে বলে।

'তুমি আবার কোত্থেকে এলে?' ছাগলকে দেখে অবাক হয় কুকুর, 'তোমার না এখন ঘাস খেয়ে ঘুমানোর সময়?'

'আরে, তোমাদের হই-হুল্লোড়ে কি শান্তিমতো ঘুমানো যায়?'

শিয়াল মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'শুধু খাওয়া আর ঘুমের গল্প করো না তো ছাগল। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সম্পর্কে জানতে হবে...।'

'আরে থামো থামো...।' পা তুলে শিয়ালকে থামায় কুকুর, 'খেজুরে থাকা অক্সিডেন্ট খেয়ে আমাদের লাভ কী?'

মুখ থেকে 'থু' করে খেজুরের বিচি ফেলে কাঠবিড়ালি, 'হ্যাঁ, কী লাভ?'

খেজুর গাছের ডালে বসে থাকা কাঠবিড়ালির দিকে তাকায় শিয়াল। তারপর দৃষ্টি নামিয়ে একে একে তাকায় ছাগল, কুকুর, সজারু ও বিড়ালের দিকে।

'মনোযোগ দিয়ে শোনো সবাই,' কাঠবিড়ালিও যেন শুনতে পায়, তাই শিয়াল একটু চিৎকার করেই বলে, 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট স্মৃতিশক্তির সমস্যা দূর করে। খেজুর খেলে ত্বকের সৌন্দর্য বজায় থাকে, চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। সবচেয়ে বড়ো কথা, খেজুর খেলে শরীরের ক্লান্তি ভাব দূর হয়...।'

শিয়ালের কথা শেষ না হতেই আরেকটা খেজুর ছিঁড়ে মুখে দেয় কাঠবিড়ালি। চিবুতে চিবুতে দুই হাত উঁচু করে বলে, 'তাই তো বলি, আমি শরীরে এত শক্তি পাচ্ছি কেন? মাত্র কয়েকটা খেজুর খেলাম। আরও কয়েকটা খেলে না জানি আমি কত শক্তিশালী হয়ে যাব...।'

গুড়ুম...!

হঠাৎ বজ্রপাতের বিকট শব্দে ভীষণভাবে চমকে উঠল সবাই।

সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটা ছোট্ট শব্দ হলো : ধুড়ুম...!

পরক্ষণেই শোনা গেল বিড়ালের চিৎকার : ম্যাও-উ-উ-উ-উহ...!

ঘটনা কী?

আচমকা ঝড়ো হাওয়ায় হাত ফসকে গাছের ওপর থেকে পড়ে গেছে কাঠবিড়ালি। আর, পড়বি তো পড় একেবারে বিড়ালের কাঁধে!

'গুড়ুম' শব্দে যতটা ভয় পেয়েছিল, 'ধুড়ুম' শব্দে তারচেয়ে বেশি ভয়ে কাবু হয়ে গেছে বিড়াল আর কাঠবিড়ালি। দু'জনই চিৎপটাং!

বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। বনের ওই পাশে, বড়ো বটগাছটার পেছনে আছে শত বছরের পুরনো একটা বাড়ি।

ছাগল, কুকুর আর শিয়াল ধরাধরি করে দাঁড় করায় বিড়াল আর কাঠবিড়ালিকে। সজারু এগিয়ে আসতেই আর্তনাদ করে ওঠে বিড়াল, 'না-আ-আ, তুমি দূরেই থাকো...।'

একটি খেজুর পড়ে আছে মাটিতে। সেটি তুলে মুখে পুরে দেয় সজারু। চিবুতে চিবুতে সবার পেছন পেছন দৌড়াতে থাকে পুরনো বাড়িটার দিকে। সেখানেই থাকে ওরা সবাই। ■

লেখক: গল্পকার ও বার্তা সম্পাদক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

গল্প

মিমিদের বৃক্ষরোপণ

রুমান হাফিজ

এবার চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ছে মিমি। পুরো নাম সুরাইয়া ইসলাম মিমি। বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব তেমন না হলেও একসাথে দলবেধে স্কুলে যাওয়া রীতিমতো তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাদের বলতে মিমির বন্ধুরা। মালিহা, সুমাইয়া আর রাফা মোট চারজন। সবাই একই ক্লাসে পড়ে। প্রতিদিন সকালবেলা এক এক করে সবাই এসে জড়ো হয় মিমিদের বাড়িতে। তারপর গল্প করতে করতে স্কুলে এসে হাজির। ঠিক তেমনিভাবে স্কুল ছুটির পর একসাথে বাড়িতে ফিরে। বিকেলবেলা আবার সবাই মিলে খেলাধুলা, গল্প আর ঘুরাঘুরি তো আছেই।

একদিন রহিম স্যার বাংলা ক্লাসে গাছ নিয়ে রচনা লিখে নিয়ে আসতে বললেন। ঠিক সময়ে জমা দেওয়ার জন্য স্যারের বেঁধে দেওয়া সময়ের আগেই তারা রচনা লিখা শেষ করল। মিমির বাড়িতে এসে তারা সবাই গাছ নিয়ে রচনা লিখছিল। হঠাৎ মালিহা সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল,

-আচ্ছা আমাদের স্কুলের মাঠ তো পুরোটাই ফাঁকা। আমরা কি সেই খালি জায়গায় গাছ লাগাতে পারি না? মালিহার কথায় সবাই একটু নড়েচড়ে বসল।

মিমি একটু যোগ করে বলল,

প্রজ্ঞা সঞ্চারী মন্ডল, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, সরকারি করনেসন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

-হ্যাঁ, খুবই ভালো কথা বলেছিস। আমরা চাইলে তো তা করতে পারি, তাই না?

সবাই সমস্বরে মিমির কথার সাথে একমত পোষণ করল।

এবার সবার থেকে বেশি চঞ্চল স্বভাবের সুমাইয়া বলল–

তো, আমরা সবাই তো আছি। এখন কীভাবে কী করতে হবে সেটা ঠিক করে নিলে আমাদের কাজটা সফল হবে।

সবাই নিজ নিজ মতামত দিতে থাকল।

কেউ ফুলের গাছ, কেউবা ফলের গাছ লাগানোর কথা বলছিল। মিমি সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল,

-আমরা ফুল, ফল দুটোই লাগাবো, কেমন! এখন কথা হচ্ছে আমরা গাছগুলো কীভাবে জোগাড় করব।

রাফা বলল, গাছ জোগাড় করা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমার বড়ো মামার বন্ধুর নার্সারি আছে। ঐ তো দক্ষিণ গ্রামে। আমরা ওখান থেকে নিতে পারি।

-তাহলে তো ভালোই হয়। কিন্তু গাছ কেনার জন্য টাকা...! মালিহার কথা পুরোটা শেষ করতে না দিয়েই মিমি বলতে লাগল,

-গাছ কেনার জন্য আমরা নিজেরা টাকা দেবো, যে যতটুকু পারি। তাছাড়া আব্ব-আম্মুদের থেকেও তো বলে নিতে পারি। কী বলিস!

সবার টাকা একত্রে করে তারা গাছ কেনার জন্য নার্সারিতে গেল। তালিকা অনুযায়ী গাছ নির্বাচন। নিমগাছ দুটো সাথে চারটা ফলের আর চারটা ফুলের গাছ কিনল তারা। তারপর দামদর ঠিকঠাক করে বাড়িতে নিয়ে আসে। পরদিন সবাই মিলে গাছগুলো স্কুলে নিয়ে আসে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সবাই মিলে প্রধান শিক্ষক ফৌজিয়া লীনা ম্যামের কাছে গেল। সবকিছুই বিস্তর জানায় ম্যামকে। সব শুনে ম্যাম তো মহাখুশি। সাথে সাথে স্কুলের সব শিক্ষক-কর্মচারীদের ডেকে পাঠালেন। মিমিদের কথা বললেন। পাশাপাশি সব ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মাঠে আসার নির্দেশও দিলেন। কর্মচারীদের দিয়ে গাছ লাগানোর সব সরঞ্জাম আনানো হলো। একে একে ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করল।

এবার প্রধান শিক্ষক লীনা ম্যাম মিমিদের নিয়ে হাজির হলেন। উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষক সবার উদ্দেশে ম্যাম তখন কিছু কথা বললেন। বিশেষ করে মিমিদের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের ব্যাপারে অনেক প্রশংসা করলেন। তাছাড়া গাছ লাগানোর উপকারিতাসহ নানা দিক নিয়ে পরামর্শমূলক কথা বললেন।

এবার গাছ রোপণের পালা। পুরো স্কুল মাঠ জুড়ে পিনপতন নীরবতা। লীনা ম্যাম একটা নিমগাছ হাতে নিয়ে গর্তের মধ্যে রোপণ করলেন। সাথে সাথে গোটা মাঠটাই করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল। লীনা ম্যাম মিমিদের জড়িয়ে ধরলেন। ওদের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। এ যে বড়ো সুখের কান্না...। ■

লেখক: গল্পকার

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সবুজে মোড়ানো বিদ্যালয়

মনজুর হোসেন

বাংলার গ্রাম, মাঠ, পথ, প্রান্তর সবুজ গাছপালার লতায়-পাতায় ঘেরা আমাদের এদেশ বাংলাদেশ। চিরচেনা এ রূপ গ্রাম থেকে ছড়িয়ে পড়েছে শহরেও। বাড়ির আঙিনা, দালানের করিডোর এবং বিস্তৃত ছাদ, সরকারি-বেসরকারি অফিস আদালতের চারপাশ সর্বত্র সবুজের সমারোহ। সবুজের এই ছোঁয়া লেগেছে আমাদের প্রিয় বিদ্যালয়গুলোতেও। আজ তোমাদের এমন এক বিদ্যালয় সম্পর্কে জানাব যেটি মোড়ানো হয়েছে গাছ দিয়ে। একটি হাজী আবদুল কাদের প্রধান উচ্চ বিদ্যালয়, এটি ঘন সবুজে ঘেরা গাজীপুরের শ্রীপুরের নিভৃত গ্রাম হায়াতখার চালায় অবস্থিত। এ স্কুলের ছাদ ও আশপাশ ঔষধি, ফলজ ও বনজ গাছে অনন্য রূপে সেজেছে। এখন সবার কাছে এটি গ্রিন ক্যাম্পাস স্কুল হিসেবে পরিচিত। আর উদ্যোক্তা হলেন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিন। তিনি ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ এটি গড়ে তুলেছেন। নাম দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু গ্রিন ক্যাম্পাস। এতে সহযোগিতা করেছেন পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি খন্দকার মো. ওবায়েদ উল্লাহ্।

বিদ্যালয়ের ছাদ ও এ আঙিনায় রয়েছে আম, জাম, আপেল, আঙুর, মাল্টা, লেবু, কমলা, জাম্বুরা, ঘৃতকুমারী, তুলসী, পুদিনাপাতা, পাথরকুচি, কোরিয়ান জিনসেং, সাদা লজ্জাবতী, অশ্বগন্ধা, ননিফল, লেটুসপাতা, ব্রকলি, চেরি টমেটো, জুকিনি, পার্সিমন, করসোল, অ্যাভোকাডো, প্যাশন ফ্রুট, পেপিনো মেলন, স্ট্রবেরি, পেয়ারাসহ ৯০ প্রজাতির গাছ। ছাদে আছে বীজতলাও। সেখানে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে চারা উৎপাদন করা হয়। বিদ্যালয়ের ছাদ জুড়ে গাছ আর গাছ।

করোনা মহামারির কারণে বিদ্যালয় এখন বন্ধ। তারপরও আশপাশের শিক্ষার্থীরা আসছেন প্রিয় গ্রিন ক্যাম্পাস দেখতে। তারা শিখছে কীভাবে গাছ লাগাতে হয়, সার প্রয়োগ করতে হয়। এছাড়াও শিখছে অর্গানিক পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদন । গ্রিন ক্যাম্পাস তৈরিতে বিদ্যালয় থেকে ফান্ডিং করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের গাছের সঙ্গে পরিচিত করা ও তাদের বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করাই হচ্ছে প্রধান উদ্দেশ্য। যে-সব ফল তারা খান কিন্তু সেটির গাছ কখনো দেখেননি, এমন অনেক ফলের গাছ আছে বিদ্যালয়ের ছাদে। আর এ ছাদবাগান পরিচর্যায় আছেন বিদ্যালয়টির শিক্ষক-কর্মচারীরা। নানা জায়গা থেকে শিক্ষকেরা এসে বিদ্যালয়ে গ্রিন ক্যাম্পাস তৈরির অভিজ্ঞতা নিয়ে যাচ্ছেন। এই কাজে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নানা সহযোগিতাও পাচ্ছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।■

লেখক: প্রাবন্ধিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বোতল বন্দি সবুজ পৃথিবী

তারেক আজিজ

গাছ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর গবেষণা নতুন কিছু নয়। বৃক্ষপ্রেমীরা নানা উপায়ে গাছ লাগান ও পরিচর্যা করে থাকেন। আবার অনেকেই শখের বসে বাড়িতে বাগান তৈরি করে থাকেন। বন্ধুরা, এবার আমি তোমাদের জানাব ব্যতিক্রমী বৃক্ষপ্রেমিকের কথা। যে কাচের স্বচ্ছ বোতলের ভেতরেই গাছ রোপণ করেছেন। গড়ে তুলেছেন একটি অভিনব বাগান যেখানে ১৯৭২ সালের পর আর পানি দেওয়া হয়নি। চমৎকার এক কার্যকর ইকোসিস্টেম। ঢাউস একটি কাচের বোতলে গাছ লাগিয়ে সিল করে তিনি একটি বদ্ধ বাগান তৈরি করেছেন। যেটি অদ্ভুতভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ! কাচের বোতলের মধ্যে গাছের বাগান সৃষ্টির বিষয়টি একটু ভিন্ন বলে মনে হচ্ছে না বন্ধুরা সেই কাহিনি রইল এবার তোমাদের জন্য।

ইংল্যান্ডের শহর থেকে ১৩ কি.মি. দূরের গ্রাম ক্রেনলে। সেখানে বাস করতেন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার ডেভিড ল্যাটিমার ও তার স্ত্রী গ্রিচেন। ডেভিডের শখ এবং নেশা ছিল বাগান করা। সুযোগ পেলেই নিজ বাড়িতে তিনি চাষ করতেন বিরল প্রজাতির অনেক গাছ। তবে বরাবরই তার পছন্দের ছিল ছোটো গাছ। যেগুলো সহজেই রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। ঠিক এমনই কিছু গাছ তিনি নিজ বাড়ির বাগানে লাগিয়েছিলেন।

১৯৬০ সালের ১৭ই এপ্রিল ছিল ইস্টার সানডে। বাগান পরিচর্যার সময় হঠাৎই ডেভিডের মাথায় আসে 'টেরারিয়াম বাগান' তৈরির ভাবনা। 'টেরারিয়াম' হলো মুখবন্ধ একটি কাচের পাত্র। যার ভেতরে ক্ষুদ্র বাগান তৈরি করা যায়। নাথানিয়াল ব্যাগশ নামের এক বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানীর লেখা পড়েছিলেন ল্যাটিমার। নাথানিয়াল ব্যাগশই ১৮৪২ সালে বিশ্বে প্রথম টেরারিয়ামের মধ্যে সুদৃশ্য এক ক্ষুদ্র বাগান তৈরি করেছিলেন। ভিক্টোরিয়ান যুগে ব্রিটেনের অভিজাতদের বাড়ির ড্রয়িংরুমে রাখা থাকত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদ দিয়ে সাজানো সব টেরারিয়াম। তখন এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে জাহাজে করে কাচের পাত্রে রাখা যায় এমন উদ্ভিদগুলো নিয়ে যাওয়া হতো ব্রিটেনে।

সঙ্গে সঙ্গেই সব কাজ ফেলে বাজারে চলে গিয়েছিলেন ল্যাটিমার। খুঁজতে শুরু করেন বড়ো এক কাচের পাত্র। যার মধ্যেই তিনি টেরারিয়াম তৈরি করবেন। পুরনো কাচের বোতলের দোকানে গিয়ে একটি ১১ গ্যালনের কাচের পাত্র যোগাড় করেন। তাতে রাখা হতো সালফিউরিক অ্যাসিড। বোতলটি বাড়ি নিয়ে এসে ভালো করে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে নেন ডেভিড। ডেভিড কাচের জারটির তলায় প্রথমে পুরু করে বিছিয়ে দিয়েছিলেন কিছু নুড়ি পাথর। ঠিক যেমনটা থাকে অ্যাকুরিয়ামে। পাত্রটির মধ্যে নুরির ওপর বিছিয়ে দিয়েছিলেন কিছুটা মাটি ও মিশ্র জৈব সার। কম্পোস্টের ভেতর তারের সাহায্যে একটা 'স্পাইডার ওয়ার্টস'গাছের অঙ্কুর লাগান যা তার বাড়ির বাগানে ছিল।

টেরারিয়াম বাগান যাতে সুন্দর দেখায় এজন্য তিনি কম্পোস্টের ওপর আবারো এক স্তর নুড়ি পাথর বিছিয়ে দেন। জারের ভেতরে স্প্রে করে দিয়েছিলেন প্রায় ২০০ মিলিলিটার পানি।। সবশেষে কাচের জারের মুখটা টাইট করে সিল করে দেন। এরপর টেরারিয়াম বাগানের জারটিকে তিনি রাখেন সিঁড়ির

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিচে, জানালা থেকে ছয় ফুট দূরে। দিনে একবার ঘণ্টা খানেকের জন্য হালকা রোদ লাগত জারটির গায়ে। ১৯৬০ সালের ১৪ই এপ্রিল থেকে কাচের জারটিকে একই জায়গায় রেখে দিয়েছিলেন ল্যাটিমার। প্রায় ২৭ বছর ধরে একই জায়গায় ছিল তার কাচের জারটি। মাঝে মধ্যে অবশ্য জারটির গায়ে জমা ধুলো মুছে দিতেন ডেভিড। আবার জারটিকে ঘুরিয়ে দিতেন, যাতে উদ্ভিদগুলো সবদিক থেকেই সমানভাবে সূর্যের আলো পেয়ে বেড়ে ওঠে। আশ্চর্যভাবে সেই অঙ্কুর থেকে বেড়ে বাগানে পরিণত হয়েছে এবং দারুণ সতেজ আছে গাছটি। বোতলের ভিতর আবদ্ধ বাস্তুসংস্থানের সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ এটি।

১৯৮৭ সালে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ক্রেনলে গ্রাম ছেড়ে ল্যাঙ্কাশায়ার চলে যান ল্যাটিমার। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন টেরারিয়ামটিও। নতুন বাড়িতে একই জায়গায় রেখেছিলেন জারটিকে। ততদিনে জারটির চারভাগের সাড়ে তিনভাগই দখল করে নিয়েছিল 'স্পাইডার ওয়ার্টস'। স্পাইডার ওয়ার্টস উদ্ভিদগুলোর জীবনধারণের জন্য দরকার ছিল, পানি, খনিজ পদার্থ, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সূর্যালোক ও অক্সিজেন। শুধু সূর্যালোক বাদে সবকয়টি উপাদানই এই উদ্ভিদ জোগাড় করে নিয়েছিল বদ্ধ জারের ভেতর থেকেই। দিনের বেলা সৌরশক্তির সাহায্যে এই উদ্ভিদগুলো নিজের খাবার তৈরি করত। কম্পোস্ট মেশানো মাটি থেকে গ্রহণ করত পানি ও খনিজ লবণ। খাবার তৈরি করার সময় গ্যাস জারের ভেতরে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন এবং পানিও ত্যাগ করত উদ্ভিদগুলো। রাতের বেলা সেই অক্সিজেন বাষ্পাকারে আবার টেনে নিয়ে শরীরের অনান্য জৈবিক কাজ চালাত। বাষ্পাকারে ত্যাগ করা পানি, ঘনীভূত হয়ে জারের গা বেয়ে নেমে আসত জারের মাটিতেই। সেই পানিই আবার স্পাইডার ওয়ার্টস টেনে নিত। আবার এই উদ্ভিদগুলোর পাতাও ঝরে পড়ত জারের নিচে। আর মাটিতে থাকা আণুবীক্ষণিক জীব পাতা পঁচিয়ে নিজেদের খাবারও জোগাড় করে নিত। পচা পাতাই হয়ে যেত উদ্ভিদের সার। সেই সার থেকেই স্পাইডার ওয়ার্টস আবারো গ্রহণ করত খনিজ পদার্থ। এভাবেই জারের ভেতর গড়ে উঠেছিল একটি পৃথক বাস্তুতন্ত্র। এক অন্য পৃথিবী।

১৯৬০ সালের পর ১৯৭২ সালে মাত্র একবারই জারের ভেতরে পানি দিয়েছিলেন ডেভিড। তারপর থেকে কেটে গেছে প্রায় ৪৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরে জারটি সম্পূর্ণ সিল করা অবস্থায় আজও আছে ডেভিডের ক্ষুদ্র এই বাগানটি। তার এই 'টেরারিয়াম বাগান' বিশ্বের মানুষের কাছে এক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। সব মিলিয়ে দীর্ঘ একটানা ৪৮ বছর ধরে কোনো কিছু ছাড়াই গাছের বেড়ে ওঠা ও গাছের বেঁচে থাকা বৃক্ষপ্রেমীদের আশার সঞ্চার ঘটাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

স্পাইডার ওয়ার্টস উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম 'কমেলিনা বেঙ্গালেন্সিস'। এটি পাওয়া যায় মূলত এশিয়া ও আফ্রিকায়। এদেশে এই উদ্ভিদকে ঢোলপাতা বা কানশিরে বলা হয়। নীল রঙের তিন পাপড়িবিশিষ্ট ফুল হয় উদ্ভিদটিতে। টেরারিয়াম বাগানের জন্য এই উদ্ভিদটিকেই বেছে নিয়েছিলেন ল্যাটিমার। ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

মো. আবদুল্লাহ বায়েজীদ
নার্সারি শ্রেণি, ইন্দ্রা স্কুল, সাভার

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বাংলা ভাষার প্রথম শব্দকোষ

তারিক মনজুর

সন্ধ্যার সময় নেহা বই পড়ছিল। তখনই জানতে পারল তথ্যটা। ভাবল, বিনু আর পিলটুকে জানালে কেমন হয়! সে প্রথমে ফোন দিল বিনুকে। বলল, 'বাংলা ভাষার প্রথম শব্দকোষের নাম কি জানো? এর নাম ভোকাবুলারি ও এম ইডিয়োমা বেঙ্গাল্লাই পর্তুগিজ।'

বিনু একটু অবাক হলো। কারণ, নেহা সন্ধ্যার পরে ফোন দেয় না। ওই সময়টা সে পড়াশোনা করে। বিনু বলল, 'কী কঠিন নাম রে বাবা! কিন্তু শব্দকোষ আবার কী?'

নেহা বলল, 'শব্দকোষ মানে অভিধান।'

বিনুর ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না শব্দকোষ মানে অভিধান। সে ছোটো করে শুধু বলল, 'ও'।

নেহা বলল, 'এটা লিখেছেন মনো এল দা আসসুম্পসাঁও।'

'কী! এটা কোনো মানুষের নাম নাকি?' বিনু একটু চমকে ওঠে। তারপর প্রশ্ন করে, 'তাউনি কোন দেশের? কবে লিখলেন এটা?'

নেহা অবশ্য এই তথ্যের বাইরে আর কিছু বলতে পারল না। ওরা ঠিক করল, পর দিন ভাষা-দাদুর কাছ থেকে আরো কিছু জেনে নেবে। পিলটুও ফোনে এসব তথ্য শুনে বলল, 'বিষয়টা নিয়ে ভাষা-দাদুর সাথে আলাপ করা দরকার।'

পরদিন বিকেলে ওরা তিনজন স্কুলের সামনের গাছতলায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল। আগের রাতে ভাষা-দাদুকে ফোনে বলে রেখেছিল নেহা। ভাষা-দাদু তাই লাঠি হাতে নিয়ে যথাসময়ে চলে এলেন স্কুলের সামনে। এসেই বললেন, 'তিনজনেই চলে এসেছ দেখছি!'

ভাষা-দাদুকে আসতে দেখে তিনজনেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

বিনু এগিয়ে গিয়ে দাদুর হাত ধরে বলল, 'তা তো এসেছি! কিন্তু এই বয়সেও তুমি সময় মেনে চলো কীভাবে, দাদু?'

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

'সময় মানার জন্য আবার বয়স লাগে নাকি!' দাদু গাছের কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর লাঠি পাশে রেখে বসতে বসতে বললেন, '...তা, তোমরাও বসো!'

বসার পর নেহা বলল, 'আমি গতকাল একটা বইয়ে পড়েছি, প্রথম বাংলা শব্দকোষের নাম ভোকাবুলারি ও এম ইডিয়োমা বেঙ্গাল্লা ই পর্তুগিজ। আর যিনি এটা লিখেছেন, তাঁর নাম মনো এল দা আসসুম্পসাঁও। এ সম্পর্কে আমরা আরও কিছু জানতে চাই।'

দাদু শুরু করতে যাবেন, এর আগেই বিনু প্রশ্ন করল, 'দাদু, শব্দকোষ মানে কি অভিধান?'

ভাষা-দাদু বললেন, 'হ্যাঁ, শব্দকোষ মানে অভিধান।'

পিলটু বলল, 'আমি তো জানি কোষ থাকে উদ্ভিদ আর প্রাণীর দেহে। উদ্ভিদ আর প্রাণীর দেহ অসংখ্য ছোটো ছোটো কোষ দিয়ে গঠিত। ...শব্দের আবার কোষ হয় নাকি?'

'ঠিক বলেছ!' ভাষা-দাদু মুচকি হাসেন,'তবে, কোষ শব্দের আরও অনেকগুলো অর্থ আছে। কোষ মানে ভাণ্ডার হতে পারে; যেমন – রাজকোষ। কোষ মানে তরবারির খাপ হতে পারে; যেমন – কোষবদ্ধ তরবারি। আবার কোষ মানে গ্রন্থ হতে পারে; যেমন – শব্দকোষ।'
বিনু সাথে যোগ করে, 'কোষ মানে কাঁঠালের কোয়াও হতে পারে। তাই না, দাদু?'

'হ্যাঁ, কোষ মানে কাঁঠালের কোয়াও হতে পারে। ...এখানে শব্দের ভাণ্ডার অর্থে শব্দকোষ হয়েছে। অভিধান মানে শব্দের ভাণ্ডার। তাই অভিধানকে আগে শব্দকোষ বলা হতো।'

'বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান কি উনি লিখেছেন?' বিনু আমতা আমতা করতে থাকে, 'ওই যে কী যেন নাম... হাঁসের ছাও, নাকি বিড়ালের ছাও...'

বিনুর কথায় সবাই হেসে ওঠে। ভাষা-দাদু বলেন, 'হাঁসের ছাও না, বিড়ালের ছাও না। তাঁর নাম আসসুম্পসাঁও। ...তবে আসসুম্পসাঁও অভিধান লিখেছেন এমন বলা ঠিক হবে না। কারণ, অভিধান আসলে লেখা হয় না। তিনি অভিধান তৈরির জন্য শব্দ সংগ্রহ করেছেন।'

'একজন মানুষ এত শব্দ সংগ্রহ করলেন কীভাবে?' পিলটু প্রশ্ন করে।

ভাষা-দাদু উত্তর দেন, 'প্রায় দশ বছর ধরে আসসুম্পসাঁও শব্দ সংগ্রহের কাজ করেছেন। তবে তিনি একা নন, তাঁর সহযোগী আরও কয়েকজন এই কাজ করেছেন। তাঁরা ছিলেন পর্তুগিজ পাদরি। ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলে এঁরা ধর্ম প্রচার করতেন। ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে অসুবিধা হতো ভাষা নিয়ে। কারণ, স্থানীয় মানুষ বাংলায় কথা বলে। আর তাদের ভাষা পর্তুগিজ। ফলে তারা শব্দ আর শব্দের অর্থ লিখে রাখতেন।'

নেহা বলল, 'কোন শব্দ লিখে রাখতেন? পর্তুগিজ শব্দ? তারপর পর্তুগিজ শব্দের বাংলা অর্থ লিখে রাখতেন?'

ভাষা-দাদু বললেন, 'দু-রকমই করেছেন। পর্তুগিজ শব্দ লিখে বাংলা অর্থ লিখেছেন; আবার বাংলা শব্দ লিখে পর্তুগিজ অর্থও লিখেছেন। ১৭৩৩ সালে শব্দ সংগ্রহের এই কাজ শুরু হয়েছিল। এভাবে প্রায় দশ বছরে অনেক শব্দ হয়ে গেল। আসসুম্পসাঁও ভাবলেন, শব্দগুলো দিয়ে একটা বই করলে কেমন হয়!'

'তারপর?' তিনজনেই একসঙ্গে বলে ওঠে।

ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, '১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে বইটি বের হয়। এর নাম তো তোমরা আগেই জেনেছ। তবে সবাই সহজ করে এটিকে বলে পর্তুগিজ-বাংলা অভিধান।'

'এটিই বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান। তাই না, দাদু?' নেহা বলে।

ভাষা-দাদু বললেন, 'এটি বাংলা ভাষার প্রথম শব্দকোষ বা অভিধান। একই সঙ্গে এটি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণও বটে!'

'ব্যাকরণ!' এবার তিনজনের অবাক হওয়ার পালা।

'হ্যাঁ, ব্যাকরণও। কারণ, ভাষা কেবল শব্দের ভাণ্ডার নয়। শব্দ ভাষায় কীভাবে ব্যবহার হয়, এরও নিয়ম

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

আছে। যেমন, আমি খাই; কিন্তু তুমি খাই হয় না। বলতে হয়, তুমি খাও। আবার সে খাও হয় না। বলতে হয়, সে খায়। বাক্যের কর্তা অনুযায়ী ক্রিয়ার এ রকম রকমফের ইংরেজি ভাষাতেও দেখতে পাবে।'

'ইংরেজিতে থার্ড পারসন সিংগুলার নাম্বার হলে ক্রিয়াতে এস বা ইএস যোগ হয়'। বিনু বলে।

ভাষা-দাদু মাথা ঝাঁকিয়ে বিনুকে সমর্থন করে বলতে থাকেন, 'আসসুম্পসাঁউ বাংলা ব্যাকরণের এ রকম অনেক নিয়মও লিখে রেখেছিলেন। অভিধানের দ্বিতীয় অংশে ব্যাকরণের সেই নিয়মগুলোও আছে। তাই এটিকে বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বইও বলা হয়।'

এই বলে ভাষা-দাদু লাঠির দিকে তাকালেন। এর মানে, তাঁর কথা প্রায় শেষ; এবার উঠতে চান। পিলটু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, 'দাদু, এখন সব শব্দই তো অভিধানে আছে! আমরা আর কোনো অভিধান বানাতে পারব না?'

ভাষা-দাদু হাতে লাঠি নিতে নিতে বললেন, 'কেন পারবে না? অবশ্যই পারবে। ...এক কাজ করো। করোনা ভাইরাস আসার পরে কিছু নতুন শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। এগুলোর একটা তালিকা তৈরি করতে থাকো। এটা করতে অবশ্য সময় লাগবে। তবে একসময় এটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে যেতে পারে!' ■

লেখক: অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাবা আমার

মেজবাউল হক

বৃষ্টির বিকেলে বেড়াতে বের হলেন বাবা ও মেয়ে। রিকশা থেকে নেমেই দৌড় দিল ছোট্ট মেয়ে। হঠাৎ ধপাস শব্দে মাটিতে কী যেন পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে বাবা দেখলেন কাদায় মেয়ে কাত হয়ে পড়ে আছে। একটু এগিয়ে হাত বাড়ালেন বাবা। ব্যথা পেয়েছ মা! বলেই কোলে তুলে নিলেন। বাবা, বৃষ্টিতে মাঠ ভিজে আছে আমি খেয়াল করিনি। ঠিক আছে চলো ধুয়ে ফেলি, কেউ না দেখার আগে। বাবা হেসে দিলেন, সাথে মেয়েও। আর মেয়ে মনে মনে ভাবল বাবা আমার কত্ত ভালো বাবা, না থাকলে কী যে হতো!। বন্ধুরা, ছোট্ট খুকির বাবার মতোই আমাদের বাবারাও আমাদের পাশে আছেন সবসময়। একটু অসুখ বা কষ্টে এগিয়ে আসেন দুই হাত মেলে। সন্তানের মাথার ওপরের ছায়ার নাম 'বাবা'। সন্তানের মুখের হাসি, আবদার পূরণে নিজের সবকিছু ত্যাগ করা, আদর-শাসন আর বিশ্বস্ততার নাম 'বাবা'। বাবার তুলনা শুধু বাবা-ই। বাবা চির আপন, চিরন্তন এক বাঁধনের নাম।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বাবার প্রতি সম্মান জানাতে প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে পালিত হয় বিশ্ব বাবা দিবস। জুন মাসের তৃতীয় রোববার পালিত হয় বাবা দিবস। সে হিসেবে এ বছর ২০শে জুন রোববার এ দিবসটি পালিত হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ দিনটি উদযাপন করা হয় বিশেষভাবেই। বাবার সংগ্রাম, কষ্ট স্মরণ করে ভালোবাসা জানান প্রিয় সন্তানেরা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক থেকে বাবা দিবস পালন শুরু হয়। মায়েদের পাশাপাশি বাবারাও যে সন্তানের প্রতি কতটা যত্নবান, সেটি বুঝাতেই এই দিবসটি পালিত হয়। বাবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশের ইচ্ছা থেকে যার শুরু। ধারণা করা হয়, ১৯০৮ সালের ৫ই জুলাই আমেরিকার এক গির্জায় এই দিনটি প্রথম পালিত হয়। আবার, ওয়াশিংটনের সনোরা স্মার্ট ডড নামের এক নারীর মধ্যে বাবা দিবসের প্রথম ধারণা আসে। ডড এই ধারণাটি পান গির্জার এক পুরোহিতের বক্তব্য থেকে।

সেই পুরোহিত মা'কে নিয়ে ভালো ভালো কথা বলছিলেন। তখনি ডডের মনে হলো, বাবাদের নিয়েও তো কিছু করা প্রয়োজন। ডড বাবাকে খুব ভালোবাসতেন। নিজ উদ্যোগেই পরের বছর, অর্থাৎ ১৯শে জুন, ১৯১০ বাবা দিবস পালন শুরু করেন। এর মধ্যে কেটে যায় অনেক বছর। অবশেষে ১৯৬৬ সালে ৫৬ বছর পর বাবা দিবসকে দেওয়া হয় স্বীকৃতি। বিশ্বে জুন মাসের তৃতীয় রবিবার পালন করা হয় বিশ্ব বাবা দিবস ।

সন্তানের প্রতি বাবার ভালোবাসা চিরন্তন। তিনি এমন এক যোদ্ধা নিজের স্বপ্নকে ত্যাগ করে সন্তানকে সুখী ও ভালো রাখতে চান সবসময়। তাই বাবা দিবসে বাবার প্রতি জানাতে পারি আলাদাভাবে একটু ভালোবাসা। দিতে পারি কোনো গিফট, হতে পারে হাসিমুখে একটি ছড়া, কবিতা। নবারুণের পক্ষ থেকে সকল বাবাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ■

সবার বাবা

আবেদীন জনী

আমার যেমন আছে বাবা
তেমন আছে ফড়িং পোকার
বাবা আছে মাছ ও ব্যাঙের
পাখি এবং জোনাক পোকার।

ফড়িং পোকার বাবা শেখায়
লাফিং ঝাপিং সবুজ মাঠে
মাছ ও ব্যাঙের বাবা শেখায়
ক্যামনে জলে সাঁতার কাটে।

সবার মতো জোনাক পোকার
বাবাও নাকি ভীষণ ভালো
শেখায় বাবা– ক্যামনে জ্বালায়
আঁধার রাতে সোনার আলো।

পাখির বাবা শেখায় উড়াল
শেখায় কিচিরমিচির ডাক
সবার বাবা চায় কি জানো?
খোকাখুকি সুখে থাক।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

টর্চলাইট

মুমতাহিনা জাহান

স্টোর রুমে টর্চলাইটটা পেয়ে মিলি অবাক হয়ে গেল। একগাদা জিনিসপত্রের নিচে ছিল সেটা। মায়ের সাথে স্টোররুমটা পরিষ্কার করতে গিয়ে সেটি পেয়েছে ও। এমন টর্চলাইট জীবনেও দেখেনি সে। এমনকি ওর মা পর্যন্ত অবাক। টর্চলাইটের বাইরের অংশটুকুতে কতগুলো চকচকে পাথর, মনে হচ্ছে যেন হীরা। আশ্চর্যের বিষয় এতদিন ধরে পড়ে থাকার পরও টর্চলাইটটায় দিব্যি আলো জ্বলছে।

মিলির বাবা নেই। মা আর বড়ো ভাইকে নিয়ে ওদের ছোট্ট পরিবার। বড়ো ভাই অমি এই বছর এসএসসি দেবে আর মিলি ক্লাস ফাইভে পড়ে। ওদের মা একটা বেসরকারি স্কুলের টিচার। বেতন মাত্র আট হাজার টাকা। এই যুগে একটি পরিবারকে ভালোমতো খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার জন্য এ অনেক সামান্য বেতন। তবুও ওরা কোনো কষ্ট প্রকাশ করে না। দেখলে মনে হয় ওদের থেকে সুখি মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

অমি আর মিলির এই সুখের কুটিরে একদিন এক ভয়ানক ঝড় উঠল। যেন সবকিছু তছনছ করে দিতে এগিয়ে এল সে ঝড়। মিলির মায়ের স্কুল থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরি হলো। যে রুম থেকে টাকা চুরি হয়েছিল, সেই রুমে মিলির মা কাজ করছিলেন। তো চোরের তকমাটা মিলির মায়ের উপরই পড়ল।

রাতারাতি মামলাও হয়ে গেল তার। অমি আর মিলি কী করবে? কীভাবে মাকে এই অপবাদ থেকে রক্ষা করবে? চিন্তা করে করে সারারাত নির্ঘুম কাটায় ওরা।

এক রাতে মিলির হঠাৎ করেই দাদুর টর্চলাইটের কথা মনে পড়ে গেল। সে অমিকে টর্চলাইটটাকে দেখিয়ে বলল, 'ভাইয়া, দেখো এই চকচকে পাথরগুলো যদি হীরা হয়, তবে এসব বিক্রি করে আমরা মাকে মুক্ত করতে পারব।'

অমি বলল, 'তোর যা কথা, এগুলো হীরে নাকি? এগুলো তো এমনিই ডিজাইনের জন্য এক্সট্রা নরমাল পাথর ব্যবহার করেছে। এখন যা, আর জেগে থাকিস না, ঘুমিয়ে পড়!'

মিলি অমির কথা শুনল না। সে চলে গেল স্টোর রুমটায়। যদি কিছু পাওয়া যায়, তবে তা দিয়ে প্রমাণ হবে ওগুলো সত্যিই হীরা। স্টোর রুমটায় অনেক খোঁজাখুঁজির পর মিলি একটা পুরনো ছেড়া ডায়েরি পেল। ডায়েরির প্রথম পাতায় একটা সাদাকালো ছবি। ছবিটা একটা যুবকের। ছবির নিচে মিলির দাদার নাম লিখা- আব্দুর রহিম। পরের পৃষ্ঠা উলটিয়ে দেখে মিলি তো আরও অবাক। সেখানে এক বিদেশি লোকের সঙ্গে তার দাদার ছবি। আর বিদেশি লোকটার হাতে সেই টর্চলাইটটা। ছবিটার নিচে লেখা: Thank you Mr. Eric for this nice gift.

তারপর মিলি ডায়েরির পাতাগুলো আরও উলটাতে থাকল। সর্বশেষ পাতায় পৌঁছে দেখল, একটা চিঠি।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ওটা ইংরেজিতে লেখা। মিলি কেবল ফাইভে পড়ে। সে ইংরেজিতে বেশ পাকা। তবে অমির মতো এত এক্সপার্ট নয়। তাই সে ডায়েরিটাকে অমির কাছে নিয়ে গেল।

অমি ঘুম ঘুম চোখ নিয়ে পুরো ডায়রিটা পড়ল। সে একটা জায়গায় এসে ভীষণ থমকে গেল। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইল সে।

মিলি জানতে চাইল, 'কী হয়েছে ভাইয়া? তুমি অমন চুপ করে আছো কেন?'

অমি শুধু বলল, Diamonds!

তারপর আবার বলল, 'যা মিলি, শুয়ে পড়। কালকে আমাদের অনেক কাজ।'

পরের দিন সকালে কোনোরকম নাশতা খেয়ে দুই ভাইবোন বেরিয়ে পড়ল। পথ চলতে চলতে মিলি বলল, 'ভাইয়া, এক সপ্তাহ ধরে আমরা কেউই স্কুলে যাই না। সামনে আমাদের দুজনেরই বোর্ড পরীক্ষা। এই দুঃসময় কবে শেষ হবে?'

অমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'চিন্তা করিস না, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

মিলি আবার জানতে চাইল, 'তারা কোথায় যাচ্ছে'।

অমি বলল, 'মেরি খালার বাসায়।'

মেরি হচ্ছেন মিলিদের মায়ের বান্ধবী। তার এক ছেলে রত্ন ব্যবসায়ী। মেরি খালার বাসায় পৌঁছে খালাকে সবকিছু খুলে বলল অমি। বলল, তারা অনেক বিপদে পড়ে এখানে এসেছে। পাড়াপ্রতিবেশী কেউ তাদের পাশে নেই।

মেরি খালা বললেন, 'দিপু সন্ধ্যায় ফিরবে। তখন তোমরা ওর সাথে আলাপ করো। আজ রাতে খেয়েদেয়ে তারপর যাবে।'

তারপর সন্ধ্যায় দিপু সাহেব এলেন। তিনি মেরি খালার একমাত্র ছেলে। দেখতে বেশ মোটাতাজা একজন লোক। অমি সেই টর্চলাইটটা তাকে দেখালো।

'দেখেন ভাইয়া, এইগুলো হীরা না?', অমি বলল।

হীরা না, তবে দম পাথর। দাম হীরার থেকে অনেক কম হবে...' দিপু সাহেব বললেন।

মিলি বলল, 'কত হবে, ভাইয়া?'

দিপু সাহেব বললেন, 'এই ধরো, তেরো-চৌদ্দ হাজারের মতো।'

অমি বলল, 'মাত্র!'

দিপু সাহেব বললেন, 'তা নয় তো কী? সব চকচকে ধাতু যেমন সোনা হয় না, তেমনি সব সাদা পাথরই হীরা না!'

দিপু সাহেব অমির হাতে ছয় হাজার টাকা গুজে দিয়ে বললেন, 'বাকি টাকাটা কয়েকদিন পড়ে দেব।'

তারপর ছয়-সাতদিন কেটে গেল। মাকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে অমিরা।

এদিকে দিপু সাহেবের ব্যাবসার অবস্থা খুবই খারাপ। একদিন সকালে নাকি দেখেন পুরো দোকান কে যেন তছনছ করে দিয়ে গেছে। দিপু সাহেবের শরীরের অবস্থাও ভালো নয়। সবসময় চুপচাপ আর ভয়ে ভয়ে থাকেন।

একদিন মেরি খালা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর কী হয়েছে, বাবা?'

দিপু আর মায়ের কাছে সংকোচ করলেন না। তিনি বলতে শুরু করলেন-

: প্রতিদিন রাতে আমার কাছে একজন ইংরেজ লোক আসেন। আর আমাকে নানাভাবে হুমকি দিয়ে যান।

'জিনে আসর করল নাকি তোকে?'

: কী জানি, মা? তবে যেদিন অমি আর মিলি এই বাড়িতে এসেছিল, সেদিন রাত থেকেই এমনটা শুরু হয়েছে।

এবার মেরি খালা কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। তারপর ছেলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বাবা, সত্যি করে বল তো ঐ পাথরগুলো সত্যিই হীরা ছিল না?'

এবার দিপু আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। মাকে সত্যিটা বলে দিলেন। টর্চলাইটের ঐ

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

পাথরগুলো হীরাই ছিল। লোভে পড়ে সহজ সরল ভাইবোনদের ঠকিয়েছেন তিনি।

তারপরের ঘটনা হলো একদিন সকালে থানা থেকে অমিদের কাছে নোটিশ এল। তাতে লেখা আজ তাদের মা'কে ছেড়ে দেয়া হবে। ওরা তাড়াতাড়ি থানায় ছুটে গেল। পুলিশ অফিসার বললেন, 'প্রকৃত টাকা চোর ধরা পড়েছে। তোমার মা নির্দোষ।'

থানা থেকে বের হয়ে আসার আগে পুলিশ অফিসার তাদের হাতে এক লাখ টাকার একটা চেক দিলেন। অমি বলল, 'এসব কে করেছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, মাকেই বা ছাড়ালো কে?'

ওসি সাহেব বললেন, 'তোমাদের এক ভাই এসেছিলেন।'

অমি আর মিলি মনে মনে সেই ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালো। কিন্তু মাকে নিয়ে যখন ওরা থানা থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরুবে, তখনই আবার সেন্ট্রির ডাক। থানার সেন্ট্রির ডাক শুনে অমি তার দিকে এগিয়ে গেল।

সেন্ট্রি বললেন, 'এই জিনিসটা দিতে ভুলে গেছিলাম। এইটা আপনাদের।'

অমি দেখল, এটা সেই অদ্ভুত টর্চলাইটটা। ■

লেখক: দ্বাদশ শ্রেণি, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ

ভিন্নধর্মী স্কুল

আব্দুল কাদের

দিনাজপুর এর বিরল উপজেলার মোঙ্গলপুর ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রাম রুদ্রপুর গ্রামের একটি স্কুল মাটি ও বাঁশ দিয়ে তৈরি। গ্রামটি শহর থেকে দূরে হলেও স্কুলটি নির্মাণের পর থেকে অনেকের কাছেই এই গ্রামটি স্কুলের নামে পরিচিত। এমনকি স্কুলটির কল্যাণে এখন দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে এটি বিখ্যাত গ্রাম। আর এ খ্যাতি ভিন্নধর্মী স্কুলের নির্মাণশৈলীর জন্য।

১৯৯৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ছোট্ট পরিসরে গড়ে উঠে এ স্কুল ।নাম দেয়া হয় মেটি স্কুল । মেটি মূলত একটি সংগঠনের নাম। পুরো নাম মডার্ন এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (মেটি)।

১০ বছর আগেও এই গ্রামে কোনোও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। গ্রামের ছেলে-মেয়েদের পায়ে হেঁটে যেতে হতো ৪-৫ কিলোমিটার দূরে পাশের গ্রামের স্কুলে লেখাপড়ার জন্য। এই কষ্ট লাঘব করার জন্য এবং গ্রামের শিশু-কিশোরদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তুলতে 'দীপশিখা' নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই স্কুল তৈরি করে।

মেটি স্কুল ছয় কক্ষ বিশিষ্ট মাটির তৈরি ৮ হাজার বর্গফুট আয়তনের একটি দোতলা ভবন। নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে মাটি, খড়, বালু ও বাঁশ, দড়ি, খড়, কাঠ, টিন, রড, ইট ও সিমেন্ট। মাটি ও খড় মেশানো কাদা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এর দেয়াল, যাতে দেয়ালে ফাটল ধরতে না পারে। এছাড়া বৃষ্টির পানি দেয়ালে লাগলে খড়ের জন্য তা নেমে যাবে তাই দেয়াল তৈরির পর সুন্দর করে সমান করা হয়েছে।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

দেয়ালের ভিতের ওপর দেওয়া হয়েছে আর্দ্রতারোধক।। প্লাস্টারে ব্যবহার করা হয়েছে মাটি ও বালু। মেঝের প্লাস্টারের জন্য পামওয়েল ও সাবানের পেস্ট ব্যবহার করা হয়েছে, যা সাধারণভাবে ওয়াটারপ্রুফ। বাইরে থেকে প্লাস্টার না করায় স্বাভাবিকভাবে উপকরণগুলো চোখে পড়ার মতো।ভবনের ভেতরে শীতের দিনে গরম এবং গরমের দিনে ঠাণ্ডার ব্যবস্থা রয়েছে।

৯ ফিট উচ্চতার ওপরে প্রথম তলায় ছাদ হিসেবে বাঁশ বিছিয়ে ও বাঁশের চাটাই দিয়ে মাটির আবরণ দেওয়া হয়েছে। ১০ ফুট উচ্চতার ওপরে দোতলার ছাদে বাঁশের সাথে কাঠ দেওয়া হয়েছে। ওপরে বৃষ্টির পানির জন্য দেওয়া হয়েছে টিন। কোথাও ইট ব্যবহার করা না হলেও ঘরের ভীত হিসেবে ইট ব্যবহার করা হয়েছে।স্কুলের ভবনগুলো তিনতলা পর্যন্ত। ভবনের প্রতিটি তলার সামনে লম্বা বারান্দা। নিচতলা থেকে তিন তলায় যাওয়ার জন্য কাঠের সিড়ি রয়েছে। প্রতিটি ভবনের সামনে বিভিন্ন ফুল ও ফলের গাছ রয়েছে।পিছনে ঘাট বাঁধানো পুকুর যার চারপাশে আছে গাছ। আছে লাইব্রেরি এবং খেলাধুলার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম ।পরিবেশবান্ধব এই স্কুলটির নির্মাণশৈলী সত্যিই মনোমুগ্ধকর। সবুজের মাঝে একেকটি ভবন দেখে মনে হবে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি করা হয়েছে ।

বর্তমানে এই স্কুলে শিশুশ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করানো হয়। ।এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের নাচ-গান-অভিনয়-চিত্রাঙ্কন, দলীয় আলোচনা ও কথোপকথন ভিত্তিক ইংরেজি শেখানোর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ শেখানো হয়। মেটির উদ্দেশ্য আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদান, শিক্ষার প্রতি স্থায়ী ও ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি, যুক্তিযুক্ত চিন্তার বিকাশ ও দলীয়ভাবে শিক্ষাগ্রহণ।

জার্মানীর 'শান্তি' দাতাসংস্থার অনুদানে অস্ট্রিয়ার লিজ ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা এ স্কুল নির্মাণে অবদান রাখেন। সহযোগিতা করেন দীপশিখা প্রকল্পের কর্মীরা। জার্মান স্থপতি অ্যানা হেরিঙ্গার ও এইকে রোওয়ার্ক এই ভবনের নকশা করেন।হয়েছে। ২০০৮ সালে বিশ্বের ১৩টি স্থাপত্যের সাথে মেটি স্কুলকে আগা খান অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়।

আমাদের চারপাশে অনেক সুন্দর নির্মাণশৈলী রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর খোঁজ আমরা রাখি না। অপরুপ সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ আমাদের এই সোনার দেশ। তাই বিদেশের সৌন্দর্য উপভোগ করার আগে এই বাংলারূপ হৃদয় দিয়ে উপভোগ করতে হবে ।■

লেখক: প্রাবন্ধিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বিরল দৌম ফল

শাহানা আফরোজ

দেখতে তালগাছের মতো কিন্তু তিন মাথাওয়ালা। কখনো দুই বা কখনো চার মাথা।গাছটি দেখতে ইংরেজি ভি- এর আকৃতির। এমন এক বিরল গাছ সম্পর্কে জানব তোমাদের। গাছটির নাম দৌম গাছ । এটি এক বীজপত্রী উদ্ভিদ।গাছের উচ্চতা ৫৬ ফুট পর্যন্ত হয়। বাকল মোটামুটি মসৃণ, গাঢ় ধূসর বর্ণের হয়। গাছের ডাল এক মিটার দীর্ঘ হতে পারে। পাতা ১২০ থেকে ১৮০ সেমি পর্যন্ত হয়। এই গাছ উপকূলীয় উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা, আরব উপদ্বীপ অঞ্চলে জন্মায়। আদি নিবাস মিশরের নীল নদের আশপাশে। ইতিহাস থেকে জানা য়ায় মিশরের ফারাওরা একে পবিত্র গাছ ভাবতো। এমনকি তাদের মৃত্যুর পর তাদের সমাধিসৌধে এই দৌম ফল দিয়ে দেয়া হতো। এই গাছের ফল দেখতে তালের মতো কিন্তু তালের থেকে আকারে ছোটো এবং প্রচণ্ড শক্ত। ফলের ভেতরের অংশও প্রায় তালের মতে। এই ফল শুকনো ফল মশলা এবং ঔষধি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এই গাছটি বাংলাদেশে এসেছিল মানিকগঞ্জের তেওতা বাড়ির জমিদারদের কারো হাত ধরে। এখনো সেখানে টিকে আছে তিনটি গাছ।

দৌম গাছের ফল, বাকল, পাতার ঔষধি গুণ আছে--

- ফলের মিশ্রণ বুকে মালিশ করলে বুকের ব্যথা কমে যায়।
- ফল থেকে তৈরি পানীয় জন্ডিসের জন্য উপকারী
- এর পাতা পানি দিয়ে জ্বাল করে তা চোখ ওঠা রোগ ভালো করার জন্য কাজ করে
- ফল কাঁচা খেলে পেটের পীড়া, হার্ট, কিডনি ও ডায়াবেটিস রোগের নিরাময়ের জন্য ভালো কাজ করে

শ্রেণিবিন্যাস

বৈজ্ঞানিক নাম: Hyphaene thebaica
জগৎ: Plantae
বিভাগ: Tracheophyta
শ্রেণি: Liliopsida
পরিবারবর্গ: Arecales
গণ: Hyphaene
প্রজাতি: Hyphaene thebaica
দ্বিপদী নাম: Hyphaene thebaica

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

শিশুশ্রম একটি জাতীয় সমস্যা। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হবে শিশুর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। তাদের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। তাই শিশুশ্রম নিরসন করে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিশুর যথাযথ বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে।

সরকার এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে সব ধরনের শিশুশ্রম হতে মুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। 'মুজিববর্ষের আহ্বান, শিশুশ্রমের অবসান' এই স্লোগানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ১২ই জুন পালিত হয় বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস। এ উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং ইউনিসেফসহ বেশকিছু বেসরকারি সংস্থা যৌথভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিন্ন ভিন্ন বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, 'সরকার শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, এ বছরের বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসের প্রতিপাদ্য যথার্থ হয়েছে'।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, '২০২১ সালকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম নিরসন বছর হিসেবে ঘোষণা করায় এ বছরের বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে'।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সরকারের পাশাপাশি শিশুশ্রম প্রতিরোধ এবং শিশুদের কল্যাণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সিভিল সোসাইটি, গণমাধ্যম, মালিক ও শ্রমিক-সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরো কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য আমি আহ্বান জানাই।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জাতীয় শিশুনীতি-২০১১, শিশু আইন-২০১৩, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ প্রণয়ন করেছে। এ ছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিশু দিবস উদযাপন, সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের পূণর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর বিকাশে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০১৯ সালে জাতিসংঘ ২০২১ সালকে আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম নিরসন বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। আই এলও ১৯৯২ সালে প্রথম শিশুশ্রমের জন্য প্রতিরোধ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুযায়ী ২০০২ সাল থেকে ১২ই জুন দিনটিকে আইএলও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবছর 'শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে।

এ দিবসের লক্ষ্য ১৪ বছরের কম বয়সি শিশুদের দ্বারা শ্রম না করিয়ে তাদের শিক্ষার সুযোগ দান ও অগ্রগতির মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা। কোনো শিশুর স্বপ্ন ও শৈশব যাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে না যায় সে উদ্দেশ্যে এ দিবস পালন করা। শিশুশ্রমের অবলুপ্তির লক্ষ্যে আইএলও ২০০২ সালে বিশ্ব শিশুশ্রমের বিরোধী দিবসের সূচনা করেছিল। শিশুদের স্বপ্ন যাতে কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ওদের হাতে বস্তা বা হাতুড়ি নয়। কলম আর বই থাকুক এটিই সবার কাম্য। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নতুন প্রাণীর সন্ধান

আবিদ সাজেদ

এশিয়ার অন্যতম বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান। বন গবেষণার অন্যতম স্থান এটি। দীর্ঘ ছয় বছর মেয়াদি গবেষণায় মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে নতুন ১৮ প্রজাতির সরিসৃপ প্রাণী ও উভচর প্রাণী পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে ১১ প্রজাতির অস্তিত্ব বাংলাদেশে নতুন। এর সঙ্গে নতুন ঘটনা হলো, আগে আবিষ্কৃত প্রাণী থেকে ২৩ প্রজাতির সরিসৃপ ও উভচর প্রাণী লাউয়াছড়ায় এখন আর পাওয়া যায়নি।

২০১১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত চলা 'ক্রিয়েটিভ কনজারভেশন এলায়েন্সের' উদ্যোগে এবং ক্যারিনাম ও বাংলাদেশ বন বিভাগের সহায়তায় লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে উভচর ও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর উপর এক গবেষণার তথ্য সম্প্রতি আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র চেকলিস্টে প্রকাশ হয়েছে।

গবেষণা সুত্রে জানা যায়, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ডেল্টা স্টেট ইউনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ড. এ এইচ এম আলি রেজা লাউয়াছড়ায় ২০১০ সালে ৪৫ প্রজাতির সরীসৃপ ও ১৫ প্রজাতির উভচর প্রাণী পান। যা পরবর্তী গবেষণায় ৫১ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ২০ প্রজাতির উভচর প্রাণী শনাক্ত করা হয়। নতুন পাওয়া সরীসৃপ ও উভচর প্রাণীর মধ্যে ১১টি বাংলাদেশে নতুন। উভচর শ্রেণির প্রাণীর মধ্যে ১৯ প্রজাতির ব্যাঙ এবং এক প্রজাতির সিসিলিয়ান জাতীয় প্রাণী পাওয়া গেছে। সরীসৃপ শ্রেণির মধ্যে পাওয়া গেছে ২ প্রজাতির গুঁইসাপ এবং ৩৫ প্রজাতির সাপ, যার মধ্যে বিষাক্ত সাপ– যেমন রাজগোখরা, অজগর, পাহাড়ি হলুদ কচ্ছপ ইতোমধ্যে সারাবিশ্বে আইইউসিএন এর তালিকায় বিপন্ন হিসেবে তালিকাভুক্ত। এছাড়া বাইবুন গেছো ব্যাঙ, চিকিলা ব্লিথের সাপের মতো প্রজাতি লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে পাওয়া গেছে। তবে বাংলাদেশের নতুন পাওয়া ১১টি প্রাণীর এখনও নামকরণ করা হয়নি।

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে ও তার আশেপাশের এলাকায় উভচর ও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটন করাই হচ্ছে গবেষণার উদ্দেশ্য। উভচর ও সরীসৃপ প্রাণীরা পরিবেশের নানারকম পরিবর্তনের প্রতি অতি সংবেদনশীল। এছাড়া এই দুই শ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে অনেকের অবস্থান খাদ্য শৃঙ্খলের একবারে নিচের দিকে। আবার কিছু আছে যাদের অবস্থান খাদ্য শৃঙ্খলের উপরের দিকে। কাজেই কোনো একটা প্রতিবেশ ব্যবস্থায় নিচের দিকের প্রাণীরা যদি দূষণ বা অন্যান্য মানবসৃষ্ট কারণে বিলুপ্তির সম্মুখীন হয় তা কার্যত সমগ্র ব্যবস্থার উপরই বিরূপ প্রভাব ফেলে। ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

শিশু দেয়ালিকার অনন্য প্রতিভা

জান্নাতে রোজী

বয়স সবেমাত্র সাড়ে চার বছর। এই বয়সেই মুখস্থ হয়ে গেছে ১৯০টি দেশের রাজধানীর নাম। শুধু রাজধানীর নামই নয় বিভিন্ন ধরনের সবজি ও ফলের ইংরেজি নামও তার আয়ত্তে। যে কেউ জানতে চাইলে সে সেকেন্ডেই বলে দিতে পারে যে কোনো দেশের রাজধানীর নাম, ফল বা সবজির ইংরেজি নাম। মেধাবী, অনন্য শিশুটির নাম দেয়ালিকা চৌধুরী।

নবারুণের দুষ্টু মিষ্টি বন্ধুরা, তোমরা হয়ত ভাবছ এ রকম তো আমরাও পারি! হ্যাঁ বন্ধুরা অবশ্যই পারো। তবে একটু মনে করে দেখো তো দেয়ালিকার মতো এত কম বয়সে এতগুলো দেশের রাজধানীর নাম কি একসঙ্গে পারতে? এ জন্যই দেয়ালিকার দক্ষতা তার অনন্য প্রতিভার পরিচয় বহন করে। আমরা তাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

দেয়ালিকা সিলেটের শ্রীমঙ্গল শহরের গুহ সড়কে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকে। সে ইতোমধ্যে শহরের নটরডেম স্কুল অ্যান্ড কলেজে নার্সারি শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। বাবা দেবাশীষ চৌধুরী ব্যবসায়ী আর মা সুস্মিতা দত্ত গৃহিণী। দেয়ালিকার এ কৃতিত্বের পেছনে মায়ের ভূমিকাই বেশি। তিনি গত বছরের ডিসেম্বর থেকে খেলাচ্ছলে মেয়েকে বিভিন্ন দেশের নাম ও রাজধানীর নাম শেখানো শুরু করেন। মেয়ে খুব দ্রুত সেগুলো আয়ত্ত করতে শুরু করলে মায়ের উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। তিনি সব দেশের নাম, রাজধানীর নাম সংগ্রহ করে তাকে শেখাতে লাগলেন। স্মরণশক্তি এত ভালো যে ১৯০টি দেশের নাম, রাজধানীর নাম দেয়ালিকার মগজে ঢুকে গেল। তারপর নিজের আগ্রহে দেয়ালিকা শিখে গেল যত সবজি আর ফলের ইংরেজি নাম।

এখন বলো, এত অল্প বয়সে এমন অনন্য প্রতিভা কয়জনের হয়!

মেনসা ইন্টারন্যাশনালের খুদে সদস্য

বিশ্বের উচ্চ আইকিউ সম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি বৈশ্বিক সংগঠন মেনসা ইন্টারন্যাশনাল। নানা ধাপ পেরিয়ে বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দিয়ে তবেই এর সদস্য হতে হয়। সম্প্রতি সংগঠনটির সদস্য হয়ে সাড়া ফেলেছে যুক্তরাষ্ট্রের শিশু ক্যাশে কুয়েস্ট। যার বয়স মাত্র দুই বছর। সিএনএন খবরে বলা হয়েছে এর মধ্য দিয়ে ক্যাশে কুয়েস্ট মেনসার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হলো।

সংগঠনটি বলছে, মার্কিনীদের গড় আইকিউ লেভেল প্রায় ১০০। সেখানে ক্যাশে কুয়েস্ট ভীষণ প্রতিভাবান। তার আইকিউ লেভেল ১৪৬ । দুই বছর বয়সেই সে ভূগোল, গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেছে। আকার ও ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে মানচিত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারে। উচ্চারণ করে বর্ণমালা পড়তে পারে। শূন্য থেকে ১০০ পর্যন্ত গুণতে পারে। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বিশেষ শিশুর ব্যায়াম

মো. জামাল উদ্দিন

অটিজম হলো স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা। এ রোগে আক্রান্ত শিশু ভাষার দক্ষতা অর্জন ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে করতে পারে না। অটিজম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিশুদের জন্য একটি সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতির দরকার হয়। এ চিকিৎসা পদ্ধতিতে ফিজিওথেরাপিরও ভূমিকা আছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক কার্যক্রমে অটিজম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিশুদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ শিশুরা অন্যদের সঙ্গে মিশতে পারে ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে, যা অটিজমের একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। বেশিরভাগ অটিজম শিশুর মাংসপেশি সমন্বয়, মাংসপেশির কার্যক্ষমতা দুর্বল বা কম থাকে। নিয়মিত ফিজিওথেরাপি দিয়ে এ সমস্যাগুলো কমিয়ে আনা সম্ভব। আর স্পিচ থেরাপির ভূমিকা তো আছেই।

ডাক্তারের চিকিৎসার পাশাপাশি বাসায় কিছু ব্যায়াম করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। এমন কিছু ব্যায়াম সম্পর্কে জেনে নাও:

❂ হাতের আঙুলের মাংসপেশির দুর্বলতার কারণে অনেকেই পেনসিল ধরতে পারে না বা খুব সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে না। এক্ষেত্রে শিশুর আঙুলের সমন্বয় ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে তাকে ডো, কাদামাটি বা ময়দার খামির দিয়ে খেলতে দিতে হবে।

❂ স্কোয়াটিং খুবই কার্যকর একটি ব্যায়াম। প্রথমে শুরু করতে হবে চেয়ারে বসা এবং ওঠা দিয়ে। এভাবে ১০ বার করা যেতে পারে। শিশু দিনে দুবার এ ব্যায়াম করবে। এরপর ধীরে ধীরে চেয়ার সরিয়ে দিয়ে ব্যায়াম করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে চেয়ার ছাড়াই একইভাবে হাঁটু ভাঁজ করে অর্ধ বসার ও ওঠার ভঙ্গি করবে শিশু। দিনের কিছুটা সময় টয়লেট সিটিংয়ের চেষ্টাও করতে হবে।

❂ শিশুকে যত বেশি বাইরে খেলাধুলায় আগ্রহী করা যায়, ততই ভালো। যেমন বল ছুড়ে দেওয়া, বাস্কেটে বল ছুড়তে বলা। এই একটি কাজই বারবার করবে। প্রতিদিন একই নিয়মে একটি কাজ করলে শিশুর মনোযোগ যেমন বাড়বে, তেমনি মাংসপেশির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে শিশু আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে এবং সামাজিকভাবে অন্যদের সঙ্গে সহজে মিশতে শিখবে।

শিশুর সঙ্গে রং নিয়ে খেলার জন্য দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করুন। এ সময়ে তার সঙ্গে মেতে উঠতে পারেন নানা রকমের খেলায়। যেমন– একটা ত্রিভুজ এঁকে তাতে রং করা। খেয়াল রাখতে হবে, শিশু যেন ধীরে ধীরে ও সময় নিয়ে কাজটা শেষ করে। এর ফলে তার মনোযোগ বাড়বে। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

দশদিগন্ত

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর হাতের লেখা

বন্ধুরা, ছোটোবেলা থেকেই আমরা হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করে এসেছি তাই না। আমাদের মধ্যে অনেকেরই হাতের লেখা খুব সুন্দর আবার অনেকের কম সুন্দর হয়। তবে হাতের লেখা সুন্দর ও স্পষ্ট হওয়া খুবই জরুরি। কারণ হাতের লেখা ভালো হলে যিনি পড়েন তিনিও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তো এখন তোমাদের এমন একজন বন্ধুর কথা বলব যার হাতের লেখা কম্পিউটারের এমএস ওয়ার্ড-এর চেয়েও বেশি সুন্দর। তার নাম প্রকৃতি মাল্লা। সে নেপালের অধিবাসী। মাল্লা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর হাতের লেখার অধিকারী। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে মাল্লার প্রতিভা সম্পর্কে জানা গিয়েছে। প্রকৃতি মাল্লা সৈনিক আওয়াসিয়া মহাবিদ্যার অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। হাতের লেখার জন্য সে এখন বিশ্ববিখ্যাত। কিছুদিন আগে নেপালের একজন তার হাতের লেখার ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছেড়ে দেন। কিছুদিনের মধ্যেই সারা বিশ্বে এটা নিয়ে তোলপাড় হয়। মাল্লার হাতের লেখা দেখলে মনে হয় কম্পিউটারের কোনো ফন্ট। তার লেখার মাঝখানের ফাঁকা জায়গাগুলো সব সমান। এছাড়া সে লিপিবিদ্যার নতুন একটি উচ্চতাও সৃষ্টি করেছে। তার লেখা প্রায় নিখুঁতের কাছাকাছি। অসাধারণ হস্তাক্ষরের জন্য নেপালি সশস্ত্রবাহিনী থেকে তাকে পুরস্কৃতও করা হয়।

বাস্তবে আয়রনম্যান

বন্ধুরা, মার্ভেল কমিকসের কাল্পনিক চরিত্র আয়রনম্যানকে তোমরা নিশ্চয়ই অনেকেই চেনো। এটি একটি কাল্পনিক চরিত্র। এবার সেই আয়রনম্যানের দেখা মিলছে যেন বাস্তবেই। ব্রিটিশ রয়েল মেরিন এবার সুপার হিরোদের মতো উড়ে বেড়ানোর পোশাক 'জেট স্যুট' ব্যবহার করতে যাচ্ছে। যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ উপকূলে এই পোশাক পড়ে প্রশিক্ষণে অংশ নেয় মেরিন সেনারা। সমুদ্রের যে-কোনো লড়াই বা অভিযানে এই পোশাক বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদী উৎপাদক প্রতিষ্ঠান গ্রাভেট ইন্ডাস্ট্রি। এই জেট স্যুট পড়ে উড়ে উড়ে তাড়া করা যাবে শত্রুকে। এছাড়া সমুদ্রে বিপদে পড়া কোনো মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে উদ্ধারেও সহায়তা করবে এই প্রযুক্তি। জেট স্যুটে থাকে পাঁচটি ছোটো আকারের জেট ইঞ্জিন। এটি ব্যবহার করে ঘণ্টায় ৩২ মাইল গতিতে ১২ হাজার ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় ওঠা যাবে।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

তিনজনের দেশ

মাত্র তিনজনের দেশ! এও আবার সম্ভব নাকি! হ্যাঁ বন্ধুরা, পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম এ দেশটির নাম 'প্রিন্সিপালিটি অব সিল্যান্ড'। সংক্ষেপে বলা হয় 'সিল্যান্ড'। পৃথিবীর প্রায় দুইশত দেশের মধ্যে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ দেশটির জনসংখ্যা মাত্র তিনজন। দেশটিতে রয়েছে নিজস্ব পতাকা, রাজধানী, পাসপোর্ট, মুদ্রা সবই। ক্ষুদ্রতম দেশটির মোট আয়তন ৫৫০ স্কয়ার মিটার। ইংল্যান্ডের উত্তর সাগরে এই রাষ্ট্রের অবস্থান। দেশটির রাজধানীর নাম এইচ এম ফোর্ট রাফস। দেশটিতে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত। মুদ্রার নাম সিল্যান্ড ডলার। যদিও বাইরের কোনো দেশে এই মুদ্রা চলে না। মূলত: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত একটি সমুদ্রবন্দর ছিল এটি। জার্মান সেনারা যে-কোনো সময় ইংল্যান্ড আক্রমণ করতে পারে এমন আশঙ্কা থেকেই ব্রিটিশ সেনারা ইংল্যান্ডের উপকূলে দুর্গ বানানোর পরিকল্পনা করে। অসংখ্য দুর্গের মধ্যে একটি পরিত্যক্ত বন্দর হচ্ছে সিল্যান্ড। পৃথিবীর কোনো দেশ এখন পর্যন্ত সিল্যান্ডকে স্বীকৃতি না দিলেও এর বিরোধিতাও করেনি। মজার কথা হলো, এদেশের জনসংখ্যার তিনজনই বেট্‌স পরিবারের সদস্য। তারাই এই রাজ্যের রাজা, রানি এবং রাজপুত্র।

একই গাছে আলু ও বেগুন

যে গাছে আলু, সে গাছেই ফলছে বেগুন! কী আশ্চর্য লাগছে বন্ধুরা? তবে ঘটনাটি সত্যি। রাজধানীর উত্তরার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজির (আইইউবিএটি) একদল গবেষক এই আজব গাছের গবেষণা করেছেন। একই গাছে দুই ধরনের ফসল উৎপাদন গবেষণায় তাঁরা সফল হয়েছেন। জোড় কলম পদ্ধতিতে এটি সম্ভব হয়েছে। আইইউবিএটি -এর গবেষক দল বেগুনের ইংরেজি পরিভাষা 'ব্রিঞ্জাল' ও 'আলু'- শব্দ দুটি একত্র করে গাছটির নাম দিয়েছেন 'ব্রিঞ্জালু'- বা বেগুনালু'। গবেষক দল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ছোটো এক টুকরো জমিতে গাছ লাগানো ও পরিচর্যার প্রথম ধাপ শুরু করেন। প্রথমে বেগুনের চারা লাগানো হয়। এর ২৫ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে রোপণ করা হয় আলুর চারাগাছ। ২০-২৫ দিন পর দেখা যায়, দুই গাছের ডালের ব্যস প্রায় সমান হয়ে গিয়েছে। এরপর বেগুন গাছ থেকে সায়ান সংগ্রহ করে আলু গাছের রুটস্ট্রোকের সঙ্গে জোড় কলম পদ্ধতিতে যুক্ত করা হয়। নির্দিষ্ট সময় পর কলমের র‍্যাপিং খুলে ফেলা হয়। ৪০-৬০ দিনের মাথায় নতুন এই গাছে ফুল আসতে শুরু করে। ৭০ দিনের মধ্যেই ফলন হয় বেশিরভাগ গাছে। ব্রিঞ্জালু উৎপাদনের পুরো প্রক্রিয়াতেই প্রাকৃতিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া সেচসহ অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও একই গাছ হওয়ায় খরচটাও কিন্তু একবারই হয়েছে। এই সফলতার আগেও ২০১৮ সালে একই গাছে টমেটো ও আলু উৎপাদনে সফল হয়েছিল এই দল। তাঁরা সেটির নাম দিয়েছিল 'টমালু'।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

মো. ওয়াজেদ হোসেন পরশ, শ্রেণি নার্সারি, ক্যালিক্স স্কুল, ঢাকা

মো. আমিনুল ইহসান বসুনীয়া, শ্রেণি ৩য়, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ফাতিমা জারা, শ্রেণি কেজি, স্যার উইলস স্কুল, গুলশান, ঢাকা

আহানাফ আহমেদ, দ্বিতীয় শ্রেণি, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুল, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ
মোবাইল অ্যাপস-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপস
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

বিশেষ প্রকাশনা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩০%

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

এজেন্সী, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
www.dfp.gov.bd

করোনার বিস্তার প্রতিরোধে

নো মাস্ক নো সার্ভিস

মাস্ক নাই তো সেবাও নাই

মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

Regd. Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-45, No-12, June 2021, Tk-20.00

মাহিমা চৌধুরী, দ্বাদশ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

Regd. Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-45, No-12, June 2021, Tk-20.00

মাহিমা চৌধুরী, দ্বাদশ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা